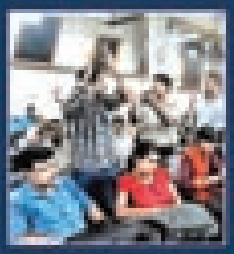

শিক্ষাক্ষেত্রে শাসকের তোষণনীতি

— পৃঃ ১৪

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

প্রতিবাদের আড়ালে ষড়যন্ত্র

— পৃঃ ২৭

৬৭ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা ॥ ২০ জুলাই ২০১৫ ॥ ৪ শ্রাবণ : ১৪২২ ॥ website : www.eswastika.com

কলুষিত শিক্ষাঙ্গন

আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজের (সান্ধ্য) অধ্যক্ষ অশোক মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের বিক্ষোভের মুখে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্মী প্রভাস সাঁতরার উপর শাসকদলের রাজনৈতিক নেতার আক্রমণ।

রায়গঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ দিলীপ দে সরকারকে এভাবেই হেনস্থা হতে হলো ছাত্র নেতাদের হাতে।

ছাত্র নেতাদের বিক্ষোভের মুখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ৩ শ্রাবণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২০ জুলাই - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

জনপ্রতিনিধিরা আগে স্বার্থত্যাগ করুন, তারপর ভরতুকি ছাড়ের উপদেশ দিন ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : কলকাতায় ইলিশ-খিচুড়ি মেলা করবেন দিদি ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ভারতের গরিমাময় বাণিজ্যিক অতীতের পুনর্নির্মাণে হাত লাগালেন মোদী ▯ গুরুচরণ দাশ ▯ ১২

শিক্ষাঙ্গনে শ্মশানের প্রেতনৃত্য ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১৪

ঈশ্বর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায়তনকে রক্ষা করুন ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ১৭

মারনাইয়ের প্রমথেশ্বর জিউ ▯ ড. বৃন্দাবন ঘোষ ▯ ২১

শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে সাহিত্য সম্রাট ▯ ২৩

প্রতিবাদের আড়ালে চক্রান্ত ▯ সন্দীপ সিং ▯ ২৭

কোপেনহেগেন ভুলে প্যারিসে জলবায়ু সম্মেলনে এগোতে চাইছে বিশ্ব ▯ ২৯

আধুনিক গ্রাম গড়ে তুলতে 'গ্রাম সঙ্গম' এক অতুলনীয় প্রচেষ্টা ▯ ৩০

ম্যাগি না মহামারী? ▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯

অন্যরকম : ৩৩ ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫-৩৬** ▯

সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮

▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দলাই লামা

প্রতিবেশী দেশ তিব্বতের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীর সম্পর্ক সুপ্রাচীন। যদিও সেই তিব্বত কার্যত এখন চীনের দখলে। তিব্বতীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ধর্মগুরু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দলাই লামা গত পঁয়ষট্টি বছর ধরে হিমাচল প্রদেশের মেখলয়েডগঞ্জে রয়েছেন। তিব্বতের নির্বাসিত সরকারের তিনি প্রেরণার উৎস। শান্তি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রবক্তা হিসেবে তিনি আজ বিশ্ববন্দিত। সম্প্রতি তাঁর আশিতম জন্মদিবস পালিত হয়ে গেল। তাঁর কথা নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ— বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দলাই লামা।

সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

অপ্রয়োজনীয় ছাত্রবিক্ষোভ

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন যে পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া বা এফ টি আই আই-কে ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স বা জাতীয়স্তরে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে চলতি বছরে প্রতি ফিল্ম ইনস্টিটিউট পড়ুয়ার জন্য সরকারি তহবিল হইতে ১২ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে এবং সেই একই উদ্দেশ্যে উন্নয়নের জন্য একজন পূর্ণ সময়ের দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী চেয়ারপার্সন নিযুক্ত করা হইয়াছে। সেই চেয়ারপার্সন গজেন্দ্র চৌহান পদটির জন্য উপযুক্ত নয় বলিয়া দেশের সর্বপ্রধান বিনোদনমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্রবিক্ষোভ চলিতেছে। উল্লেখ্য, চেয়ারপার্সন পদটি শিক্ষকের নয়, নিছকই প্রশাসনিক। প্রশাসক হিসাবে গজেন্দ্র চৌহানের যোগ্যতা রহিয়াছে কিনা সেই পরীক্ষা এখনও হয় নাই গজেন্দ্র যদি কাজ শুরু করিয়া অপদার্থতার প্রমাণ দিতেন, তখন প্রতিবাদ আন্দোলন করিলে তাহা অধিক যুক্তিসঙ্গত হইত। সুতরাং এই অপ্রয়োজনীয় বিদ্রোহ-বিলাস কিসের জন্য? বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ দেশের প্রখ্যাত একটি সংস্থায় উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকেই দায়িত্ব দিতে হইবে। প্রশ্ন হইল, চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবার জন্য চলচ্চিত্রের যুগ পুরুষ হওয়া আবশ্যক কিনা? এবং তাহার পরেও এই সংস্থায় কোনো চলচ্চিত্রের যুগপুরুষের আসিবার আগ্রহ রহিয়াছে কিনা। অমিতাভ বচ্চন আগ্রহী হন নাই বলিয়া শোনা যাইতেছে। এই অনাগ্রহের কারণও প্রণিধানযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানে পূর্বে মহেশ ভাটকেও গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদ হইতে ইস্তফা দিতে হইয়াছিল ছাত্রধর্মঘটের কারণে। অসামান্য অভিনেতা মোহন আগাশে-কেও এই সংস্থার ছাত্রেরা প্রতিবাদের জোরে ডিরেক্টরের পদ হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। আর এক প্রখ্যাত অভিনেতা দিলীপকুমারকেও এক সমাবর্তনে কালো কাপড় বাঁধিয়া বিক্ষোভ দেখাইয়াছিল এই সংস্থার ছাত্ররাই। প্রতিবাদের দাপটে এই শিক্ষাসংস্থায় শেষ সমাবর্তন হইয়াছিল ১৯৯৭ সালে। তাহার পর আর কোনো সমাবর্তন হইতে পারে নাই। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেন এই অব্যবস্থা? আজ যাঁহারা প্রতিষ্ঠানটির স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করিবার কথা বলিতেছেন তাহারা প্রতিষ্ঠানটির এই অব্যবস্থা প্রসঙ্গে এতকাল নিশ্চুপ ছিলেন কেন? ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার কোনোভাবেই এই প্রতিষ্ঠানটির স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করে নাই, কেবল একজন ব্যক্তিকে প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করিয়া দায়িত্ব পালন করিয়াছে মাত্র। ইহার পর কেহ যদি দাবি করিয়া থাকেন ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াই সকলের নিযুক্তি করিতে হইবে তাহা হইলে সেইটি কুযুক্তি বলিয়াই ধরিতে হইবে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ক্ষমতা বিন্যাস থাকিবেই এবং ছাত্রদেরও একটি পর্যায় পর্যন্ত শৃঙ্খলা ও আনুগত্য-সহ কিছু অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে। কেননা তাহা না হইলেই বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকিবে। এই ক্ষেত্রেও যেমন ঘটিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির শৃঙ্খলাহীনতা বহুদিন ধরিয়া চলিতেছে। এই শৃঙ্খলাহীনতার কারণেই ১৯৮৯ সালের পর ১৯৯৭ সালে শেষ সমাবর্তন হয়। তাহার পর সমাবর্তন হইতে পারে নাই। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটির বিশৃঙ্খল অবস্থা অবসানের জন্য চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহা লইয়া যাহা চলিতেছে তাহা অপ্রয়োজনীয়। এই সুযোগে ঘোলাজলে অনেকেই মাছ ধরিতে নামিয়া পড়িয়াছে এবং বিষয়টিকে রাজনৈতিক রঙ চড়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। এখন গজেন্দ্র চৌহানকে নিয়োগ করা বিচক্ষণ কর্ম হয় নাই বলিলে তাহাকে পদচ্যুত করা আরও বেশি অবিচক্ষণতার পরিচায়ক হইবে।

সুভাষিতম্

ন চোরাহার্যম্ ন চ রাজহার্যম্
ন ভ্রাতৃভাজ্যং ন চ ভারকারি।
ব্যয়ে কৃতে বর্ধতে এবং নিত্যং
বিদ্যাধনং সর্বধনপ্রধানম্।।

যা চোর চুরি করতে পারে না, রাজা হরণ করতে পারে না, ভাই ভাগ নিতে পারে না, যা কখনও বোঝাস্বরূপ হয়ই না, যা নিত্য খরচ করলেও বাড়তে থাকে—সেই বিদ্যাধন সমস্ত ধনের মধ্যে প্রধান।

সরকারি হাইস্কুলে ইফতারের সময়সূচী বিতরণ

সংবাদদাতা॥ সরকারি স্কুল থেকে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা চলছে ইফতারের সময়সূচি। যা শুনে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে এটি মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালিত একটি স্কুল। কিন্তু নদীয়া জেলার চাপড়া থানার অন্তর্গত রানাবন্দ সেন্ট মেরীজ হাইস্কুল হলো ওয়েষ্টবেঙ্গল বোর্ড অফ হাইয়ার সেকেন্ডারি নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত একটি স্কুল। এই স্কুলেই বিতরণ করা হয়েছে ইফতারের সময়সূচি। যেখানে এক নতুন বিতর্ক দানা বেঁধেছে। জানা যায়, রানাবন্দ সেন্ট মেরীজ হাইস্কুলের পক্ষ থেকে সাহরী এবং ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে রমজান মাসের সাহরী এবং ইফতার কখন তার সময় ধরে উল্লেখ করা আছে। যা অতি উৎসাহে স্কুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিতরণ করা চলছে। তবে এই ঘটনায় অ-মুসলমান ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের দাবি, 'আপাতদৃষ্টিতে এইরকম ঘটনা মাদ্রাসা বোর্ড পরিচালিত স্কুলগুলিতে দেখা গেলেও এই স্কুলে তা কোনোদিনই হয়নি। এর থেকে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ধারণা হাইস্কুলটিকে মাদ্রাসায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা হচ্ছে। অথবা সীমান্তবর্তী এলাকাতে স্কুল হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন সিমির প্রচ্ছন্ন মদতে এই ধরনের কার্ড বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। তবে এই লিফলেটে স্কুলের নাম দেওয়া থাকলেও প্রকাশক বা মুদ্রণ সংস্থার কোনো নাম উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে স্কুলের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রানাবন্দ সেন্ট মেরীজ হাইস্কুলটি তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালন সমিতি পরিচালিত। তাই রাজ্যের শাসকদল বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে যেভাবে তোষণ করে চলেছে এবার সেই একই কায়দায় এগোতে দেখা যাচ্ছে স্কুল সভাপতি সাইফুল মন্ডল পরিচালিত এই স্কুলকে। এক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দারা অন্য কিছুর আশঙ্কা করছে। উল্লেখ্য, গত তিন বছর আগে এই রানাবন্দ এলাকা থেকেই আনোয়ার হোসেন মল্লিক নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। জানা যায়, আই এস জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে এই ব্যক্তির যোগসাজস থাকার কারণে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সরকার অধিগৃহীত স্কুলে এইরকম এক কর্মসূচি গ্রহণ করায় রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরে যোগাযোগ করা হলে তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়— সরকারের পক্ষ থেকে স্কুলগুলিকে এরকম কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ সেন্ট মেরীজ হাইস্কুল নিজেদের দিক থেকেই এই উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় বসুকে বহুবার ফোন করা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পাশাপাশি এলাকার মানুষের আরও ক্ষোভ ৭৬ বছরের পুরনো এই স্কুলটি আজ পর্যন্ত কোনো অনিয়মিত প্রধান শিক্ষক দেখেনি। সদ্য নিযুক্ত এই প্রধান শিক্ষক সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন স্কুলে উপস্থিত থাকলেও তার সময়সূচি মাত্র দুপুর ২টা পর্যন্ত। অর্থাৎ স্কুলের সর্বময় কর্তা বলতে স্কুল সভাপতি সাইফুল মণ্ডল। তার মদতেই স্কুলে এরকম অরাজকতা চলছে বলে অভিযোগ।

সরস্বতী নদী গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এন ডি এ সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সরস্বতী নদী প্রকল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। এরই অঙ্গ হিসাবে গত ২৯ জুন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী মহেশ শর্মা এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টারের মধ্যে এই প্রকল্প নিয়ে আলোচনার পরেই কেন্দ্রীয় সরকার সরস্বতী নদীর গতিপথ অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য হরিয়ানায় একটি গবেষণাকেন্দ্র ও মিউজিয়াম তৈরির কথা ঘোষণা করেছে। হরিয়ানার যমুনানগরের মুঘলওয়ালি গ্রামে কৃষ্ণ সার্কিটের এক অংশে মিউজিয়ামটি গড়ে তোলা হবে বলে স্থির হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে পর্যটন মন্ত্রকের পিলগ্রিমেজ রিজুভিনেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি ওগমেনটেশন ড্রাইভ স্কীমের পক্ষ থেকে ২০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। ১০ হাজার বছর পূর্বে ঋক্‌বেদে উল্লিখিত সরস্বতী নদীর উৎস আদিবদ্রী বলে মনে করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে এই উদ্দেশে বিনজোরের প্রাচীন স্তূপে খননকার্য চলছে এবং এখনও পর্যন্ত এই কাজে ২৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

তহবিল তছরূপের দায়ে তিস্তা শিতলবাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল সি বি আই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি নথিবদ্ধকরণ না থাকা ও সরকারের অগ্রিম অনুমতি ছাড়াই বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে বেআইনিভাবে অর্থ সংগ্রহের দায়ে সিবিআই— তিস্তা শিতলবাদ, তাঁর স্বামী জাভেদ আনন্দ, ব্যবসায়ী গুলাম মহম্মদ পশমিন ও সবরং কম্যুনিকেশন নামের প্রকাশনা সংস্থা (এস সি পি পি এল)-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। প্রসঙ্গত গৃহমন্ত্রকের পক্ষে দিন দশেক আগে বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত আইন ও বিদেশি অনুদান গ্রহণের খুঁটিনাটি নিয়ে সিবিআই-কে তিস্তা ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে বলা হয়। তারই ফলশ্রুতিতে সিবিআই থানায় এফ আই আর দাখিল করে।

সিবিআই সূত্র অনুযায়ী তিস্তা, তাঁর স্বামী আনন্দ ও মহম্মদ পশমিন সকলেই সিটিজেন্স ফর জাস্টিস নামক সংস্থার পত্তন করেছিলেন। গৃহমন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী ফরেন কনট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট (এফ সি আর এ)-এর নিয়ম অনুসারে সংস্থা বিদেশ থেকে পাওয়া অর্থ বেআইনিভাবে ভিন্নপথে চালান করেছে (Diversion of fund) কিনা সেই অভিযোগের তদন্তে নেমেই সিবিআই প্রাথমিকভাবে তিস্তার সংস্থায় গরমিল পেয়েছে। এই ধরনের বেআইনিভাবে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় আইনে ৫ বছর পর্যন্ত জেল হওয়ার নিদান রয়েছে। সূত্র অনুযায়ী তিস্তার দুই সংস্থা সি জে পি ও সবরং ট্রাস্ট উভয়েই যে উদ্দেশ্যে বিদেশি অনুদান পায় সেই খাতে টাকা খরচ না করে টাকা এস সি পি পি এল (যেটিও তিস্তারই সংস্থা)-এর অ্যাকাউন্টে পাচার করে দেয়। হিসেব অনুযায়ী এস সি পি পি এল ২.৯ লক্ষ ডলার (১.৭৫ কোটি টাকা) যা ফোর্ড ফাউন্ডেশনের পক্ষে সবরং ট্রাস্টকে দেওয়া হয়েছিল ও আলাদা ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা এফ সি আর এ লঙ্ঘন করে ট্রাস্ট গ্রহণ করেছিল। সব শেষ খবর অনুযায়ী সিবিআই কোম্পানির হিসেব নিকেশ ছাড়াও গৃহমন্ত্রকের পক্ষে ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৫ সময়কালে যে অনুসন্ধান রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল তাও খতিয়ে দেখছে।

গুজরাট পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, গুজরাট দাঙ্গার পর পীড়িতদের জন্য বরাদ্দ টাকা তিস্তা ভিন্নক্ষেত্রে চালান করা শুধু নয়— তা নয়ছয় করেছেন। তিস্তা সেই সময় এই অভিযোগটি তৎকালীন গুজরাটের মোদী সরকারের চক্রান্ত বলেছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহের চিঠির বয়ান অনুযায়ী যেহেতু টাকার পরিমাণ ১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে তাই এই অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে সিবিআই-কে এফ সি আর এ-এর ৪৩ ও ৪৬ ধারায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত তদন্ত করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা নতুন করে পর্যালোচনার সময় এসেছে : ভাসিম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমমনোভাবাপন্ন সাংস্কৃতিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী ভারতীয় শিক্ষা মণ্ডল (ভাসিম) বেশ কয়েক বছর ধরে এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করে আসছে। সম্প্রতি ভাসিম সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলির সংজ্ঞা যথাযথভাবে পর্যালোচনা করার জন্য সর্বোচ্চ আদলতে একটি 'রিভিউ পিটিশন' দাখিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী ভারতের সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাগুলির অপব্যবহার করছে। এ প্রসঙ্গে তাঁদের অভিমত কোনো প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু কিনা তা বিবেচিত হওয়া উচিত সেখানকার পরিচালকমণ্ডলীর জাত ধর্মের ভিত্তিতে নয়, সমগ্র ছাত্র মণ্ডলীর জাতিগত বিন্যাসের ভিত্তিতে।

ভাসিম-এর সংগঠন সম্পাদক মুকুল কানিতকারের বক্তব্য অনুযায়ী অতীতে প্রতিষ্ঠার সময় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরির উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আজকের তথাকথিত সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলিতে অসংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাই বেশি। উদাহরণ দিয়ে কানিতকার বলেন, বেশিরভাগ সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকমণ্ডলীই কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, অথচ গরিষ্ঠাংশ ছাত্রছাত্রীই সাধারণ সম্প্রদায়ের। দেখা যাচ্ছে, এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের চালু করা রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টের আওতায় সকল ছাত্রদের পক্ষে সুবিধাজনক ধারাগুলি তাদের সংখ্যালঘু চরিত্রের অছিলায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োগ করছে না। এই ঘটনা নিত্যদিন ঘটে চলেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কানিতকার জানান যে হয় সংখ্যালঘু তকমার বৈশিষ্ট্যগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ দাবি করা হবে নয়ত সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাস্তা বার করতে হবে। তাঁরা দু'টি পথই খোলা রাখছেন বলে প্রকাশ।

কানিতকারের বয়ান অনুযায়ী একমাত্র সংখ্যালঘুরাই যেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করে। কেবলমাত্র সংস্থার পরিচালকরা সংখ্যালঘু হলেই যে কেউ সংখ্যালঘুর প্রাপ্যে ভাগ বসাতে পারে না। ইতিমধ্যেই তাঁরা আইনি পরামর্শ নিচ্ছেন সর্বোচ্চ আদালতে নিজেদের পার্টি করে কোনো মামলা দায়ের করতে পারেন কিনা। প্রসঙ্গত সংবিধানের আর্টিকেল ৩০ (১) ধারার ভাষাগত ও ধর্মগত সম্প্রদায়কে তাদের প্রয়োজন মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা ও পরিচালনা করার অধিকার দিয়েছে। সংবিধানের ১৩ ধারায় এই অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর কোনো বিচ্যুতি হলে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

বিহারে বিধান পরিষদের অর্ধেক আসন দখল এনডিএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিহারে বিজেপি বিরোধী জোটকে যে সে রাজ্যের মানুষ মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না, তা প্রমাণ হয়ে গেল সাম্প্রতিক বিধান পরিষদের নির্বাচনে। বিজেপি-কে আটকাতে নীতিশ কুমারের সংযুক্ত জনতা দল, লালুপ্রসাদের রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবং কংগ্রেস পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলালেও ২৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই জিতে নিল ১১টি আসন। সহযোগী রামবিলাস পাসোয়ানের লোক জনতা পার্টি ১টি আসন জিতেছে। সব মিলিয়ে এনডিএ-র দখলে গিয়েছে অর্ধেক অর্থাৎ ১২টি আসন। বিরোধী জোট পেয়েছে ১০টি আসন। যার মধ্যে জে ডি ইউ ৫, আর জে ডি ৪ এবং কংগ্রেস ১। দু'টি আসন গিয়েছে নির্দল প্রার্থীদের জিম্মায়। এর মধ্যে রিতলাল যাদব পাটনা এবং অশোক কুমার আগরওয়াল কাটিহার থেকে জয়ী হয়েছেন। গত বারের ফলাফলের দিকে চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে নীতিশের জে ডি (ইউ) ১৩টি, বিজেপি ৫টি, আর জে ডি ৩টি এবং নির্দল ৩টি আসনে জয়লাভ করেছিল। সেই দিক দিয়ে দেখলে এবারের ফল বিজেপি-র পক্ষে যথেষ্ট আশাব্যাঞ্জক। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে নরেন্দ্র মোদী-কে বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করায় এনডিএ সঙ্গ ছাড়েন নীতিশ। তারপর লোকসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়ে তাঁর দল। মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিও ছাড়তে হয় তাঁকে। এরপর আবার ক্ষমতার লোভে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে ফেরা। লালুপ্রসাদ ও কংগ্রেসের মতো এককালের রাজনৈতিক শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে আটকানোর চেষ্টাকে কোনোমতেই যে সুনজরে দেখেনি বিহারের মানুষ সাম্প্রতিক আইনসভা নির্বাচনেই তা প্রমাণিত হয়ে গেল বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। নীতিশ-লালুপ্রসাদের এই পরস্পর-বিরোধী জোটের প্রেক্ষিতে অত্যুৎসাহীরা সাতের দশকে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে জরুরি অবস্থা বিরোধী আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলেও যেখানে কংগ্রেসের অস্তিত্ব রয়েছে তা যে ব্যুমেরাং হবেই সেটা জানাই ছিল। স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে পরিষদে পর্যুদস্ত হবার ধাক্কা নীতিশ-লালুর এই সুবিধাবাদী জোট কতটা সামাল দিতে পারবে বা আদৌ পারবে কি না সেটাই এখন দেখার।

সুশীল মোদী

রামবিলাস পাশোয়ান

এল পি জি ভরতুকি ছেড়েছেন দশ লক্ষেরও বেশি গ্রাহক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দশ লক্ষেরও বেশি গ্রাহক রান্নার গ্যাসে তাঁদের ভরতুকি ছাড়ার কথা নথিভুক্ত করিয়েছেন। এই মুহূর্তে দেশের তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল (ইন্ডেন), ভারত পেট্রোলিয়াম (ভারত গ্যাস) এবং হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম (এইচ পি)-এ গ্রাহক সংখ্যা মোট ১৫.৩ কোটি। ভরতুকিতে বছরে ১২টা গ্যাস সিলিন্ডার দিতে সরকারের খরচ পড়ে প্রায় ৪০,০০০ কোটি টাকা। দেশের এমন অনেক মানুষের কাছে গ্যাসে ভরতুকির টাকা পৌঁছোয়, অর্থনৈতিকভাবে যাঁরা যথেষ্ট সাবলীল। এঁরা ভরতুকি ছাড়লে একদিকে যেমন দেশের কোষাগার থেকে অহেতুক টাকা গুনতে হবে না, তেমনি যে দরিদ্র মানুষের গৃহ আজও গ্যাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত তাঁদের ঘরেও সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু এর জন্য যে জনসচেতনতার প্রয়োজন ছিল, তা বৃদ্ধিতে সরকারি পক্ষ থেকে এতদিন কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মোদী সরকার টিভি, রেডিয়ো, সংবাদমাধ্যম সর্বত্র এনিয়ে প্রচারের উদ্যোগ নেওয়ায় তাতে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে। এখন মোবাইলে কিংবা অনলাইনে এ বিষয়ে নথিভুক্তিকরণের সুযোগ মেলায় পদ্ধতিও সহজ হয়েছে।

তেল সংস্থাগুলির আশা আগামীদিনে প্রায় ১ কোটি গ্রাহক এই ভরতুকি ছেড়ে দেবেন। এব্যাপারে রাজ্যগুলির মধ্যে এখনও শীর্ষস্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। ২.০৯ লক্ষ গ্রাহক সেখানে ভরতুকি ছেড়েছেন। এরপরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, জনসংখ্যার কারণে উত্তরপ্রদেশেই এল পি জি গ্রাহক এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি এবং সেখানে ভরতুকি ত্যাগের পেছনে বিপুল জনসমর্থনের ইঙ্গিত মিলেছে। নয়ডার মতো শিল্পাঞ্চলের এলপিজি ভরতুকি ছাড়ার হার লক্ষণীয়। দক্ষিণের রাজ্যগুলিতেও ২.১৬ লক্ষ গ্রাহক মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। এর মধ্যে কর্ণাটকে ৭৮,৩০৭ জন, তামিলনাড়ুতে ৬৭,০৯৬ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ৩১,৭১১ জন রয়েছেন। এই তালিকায় বিখ্যাতদের মধ্যে রয়েছেন আজিম প্রেমজির স্ত্রী, অভিনেতা কমল হাসান, চিত্র-পরিচালক মণিরত্নম প্রমুখ।

ত্রিপুরায় সঙ্ঘের শাখায় আক্রমণ সিপিএম বিধায়কের

সংবাদদাতা॥ গত ৬ জুলাই ত্রিপুরার নলছড়ের কিন্নামুড়ায় সিপিএম বিধায়ক তপন কুমার দাসের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায় পরিকল্পিত আক্রমণ করা হয়। সেদিন প্রভাত শাখায় যথারীতি যোগাভ্যাস-সহ শারীরিক কার্যক্রম চলাকালীন বিধায়ক তপন কুমার দাস বেশকিছু ক্যাডার-সহ স্বয়ংসেবকদের ওপর চড়াও হন। অকথ্য ভাষায় স্বয়ংসেবকদের তারা গালিগালাজ করতে থাকেন। সঙ্ঘের শাখা এখানে করা যাবে না বলে হুমকিও দেন। শাখার দুই কার্যকর্তা রূপময় ঘোষ ও অক্ষয় দেবনাথ প্রতিবাদ করলে তাদের মারধোর করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই বিধায়ক পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে রূপময় ও অক্ষয়কে থানায় তুলে নিয়ে যায়। সিপিএমের চাপে পুলিশ দীর্ঘ সময় তাদের থানায় বসিয়ে রাখে। পরে স্থানীয় স্বয়ংসেবকদের তীব্র ক্ষোভ আন্দাজ করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখার ওপর হামলা চালানোর জন্য তপন দাস-সহ সিপিএমের ছ'জন ক্যাডারের বিরুদ্ধে মেলাঘর থানায় এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে ত্রিপুরাতেই সঙ্ঘের তৎকালীন ক্ষেত্রকার্যবাহ শ্যামলকান্তি সেনগুপ্ত ও তিনজন প্রচারক— সুধাময় দত্ত, দীনেন দে ও কাঞ্চন ভট্টাচার্যকে অপহরণ করে হত্যা করে দেশবিরোধী শক্তি।

ঘটনার তীব্র নিন্দা করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ অসম প্রান্তের কার্যবাহ ক্ষৌণিশ চক্রবর্তী বলেন, হিন্দু সমাজের কাজকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে দেখাটা বদভ্যাসে পরিণত হয়েছে সিপিএমের।

রূপময় ঘোষ ও অক্ষয় দেবনাথকে সংবর্ধনা দিচ্ছে জনতা।

হিন্দু সমাজ সিপিএমের এমন আচরণ মোটেই সুনজরে দেখে না। অচিরেই সিপিএমের এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের উচিত শিক্ষা দেবে ত্রিপুরার ৮৫ শতাংশ হিন্দু নাগরিক।

পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের সহ-ক্ষেত্র প্রচারক গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী বিধায়কের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, বিধায়ক তপন কুমার দাস আগেও কয়েকবার এরকম আচরণ করেছেন। এ কারণে ত্রিপুরায় সিপিএমের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছে।

নাসিক ত্র্যম্বকেশ্বরে মহাকুম্ভ মেলার শুভারম্ভ করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস।

জনপ্রতিনিধিরা আগে স্বার্থত্যাগ করুক, তারপর ভরতুকি ছাড়ের উপদেশ দিন

আমি ভারত সরকারের এস এম এসটি আমার মোবাইল ফোনে বেশ কয়েকবার পেয়েছি। আপনারাও অনেকেই নিশ্চয় পেয়েছেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে রান্নার গ্যাস ব্যবহারকারী গ্রাহকদের কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে যে তাঁরা যেন স্বেচ্ছায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের জন্য প্রাপ্য সরকারি ভরতুকি নেওয়াটা বন্ধ করেন। মানছি, ভরতুকি ছেড়ে দিলে ভারত সরকারের কোষাগারের বাড়তি বোঝা কিছুটা কমবে। রান্নার গ্যাসের গ্রাহকরা এখন বছরে ১২টি গ্যাস সিলিন্ডার সরকারি ভরতুকিতে পান। সরকারের দেয় ভরতুকির টাকাটা তেল কোম্পানিগুলি গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠিয়ে দেয়। একজন উপভোক্তা ১২টি সিলিন্ডারের জন্য সাধারণভাবে প্রায় তিন হাজার টাকা প্রতি বছর পেয়ে যাবেন। ভারত সরকারের বক্তব্য, ভরতুকি দিয়ে দেশের অর্থনীতিতে 'অচ্ছে দিন' আনা সম্ভব নয়। এই যুক্তি অস্বীকার করতে পারা যায় না।

বাংলা ভাষায় একটি প্রচলিত কথা আছে, 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও'। অর্থাৎ আগে নিজে স্বার্থত্যাগ করো। তারপর অন্যদের উপদেশ দাও। সম্প্রতি তথ্য জানার অধিকার আইনের সাহায্যে সমাজকর্মী সুভাষ আগরওয়াল দেশবাসীকে জানিয়েছেন যে মাননীয় সাংসদদের সস্তায় খাওয়ার জন্য সংসদের ক্যান্টিনের পরিচালনায় বছরে ৬৫ কোটি টাকা ভরতুকি দিতে হয়। সাংসদদের রোজগার যেখানে মাসে দেড় লক্ষ টাকা সেখানে তাঁরা কেন সরকারি ভরতুকি পাবেন। পার্লামেন্টের ক্যান্টিনের খাবার-দাবারে ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ সরকারি ভরতুকি দেওয়া হয়। অর্থাৎ, সাংসদরা প্রায় বিনা মূল্যেই ভরপেট খান। মনে রাখতে হবে যে সাংসদদের বিমানে বা ট্রেনে সস্ত্রীক ভ্রমণ একেবারে ফ্রি। দেশের যে কোনো রাজ্যে তাঁরা বিনি পয়সায় ঘুরতে পারেন। তাঁদের

গুরুপুরুষের কলম

টেলিফোন, রান্নার গ্যাস, ইলেকট্রিকের বিল সরকার মেটায়। সাংসদদের চিকিৎসার খরচ ও বাড়ি ভাড়াও সরকার দেয়। সাংসদদের থেকে মন্ত্রীরা আরও অনেক বেশি আর্থিক সুবিধা ভারত সরকারের কাছ থেকে পান। দেশের মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাজকার্য করছেন বলে তাঁদের রাজকীয় খরচ গরিব জনগণের করের টাকা থেকে দিতে হবে ভারতীয় সংবিধানে এমন কোনো নির্দেশ নেই। সংসদের ক্যান্টিনে এক থালা ভাল চালের ভাতের দাম মাত্র দু' টাকা। এই দামে ফুটপাথের দোকানেও এক থালা ভাত পাওয়া যাবে না। মানছি, সাংসদদের স্বাচ্ছন্দের জন্য যে টাকা ভরতুকি দেওয়া হয় তার তুলনায় গরিবগুর্বো মানুষগুলোকে রান্নার গ্যাসের দেয় ভরতুকির টাকার অঙ্ক অনেক বেশি। প্রশ্নটা নৈতিকতার। জনপ্রতিনিধিরা আগে স্বার্থত্যাগ করুক। তারপর ভরতুকি ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিন। সংসদের ক্যান্টিনে ২ টাকার ভাতকে ২০ টাকা করলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে না। মন্ত্রী সাংসদদের রোজগার যথেষ্ট ভাল। তাঁরা যে কত রকম ভাতা পান হিসেব করতে গেলে মাথা ঘুরে যাবে। তারপরেও তাঁদের ৩০ টাকায় রাজকীয় মধ্যাহ্নভোজ ভরতুকিতে দিতে হবে। কেন? যে জনপ্রতিনিধিরা এতকাল ধরে জনগণের করের টাকায় ভরতুকিযুক্ত খাবার খেয়ে চলেছেন, তাঁরা কি করে নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমজনতাকে ভরতুকি তুলে দেওয়ার কথা বলেন? সময় এসেছে জনপ্রতিনিধিদের মুখের উপর বলার যে, জনগণের টাকা নষ্ট করার অধিকার আমরা তাঁদের দিইনি। প্রধানমন্ত্রী থেকে তাঁর মন্ত্রীসভার সব সদস্য, মাননীয় সাংসদরা প্রথমে তাঁদের বিনি পয়সায় প্রাপ্য রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার নেওয়া বন্ধ করুন। তারপর উপদেশ দিন সাধারণ মানুষকে ভরতুকি না নিতে। রান্নার গ্যাস, কেরোসিনের দাম এখন যথেষ্ট বেশি। ফলে সাধারণ মানুষের হেঁসেলের খরচও বহু গুণ বেড়েছে। হ্যাঁ, তাই স্পষ্টভাষায় বলতে হবে নেতা-মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ আমলাদের প্রাপ্য নানা ধরনের সরকারি সুবিধা ছেঁটে ফেলা হোক।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

কলকাতায় ইলিশ-খিচুড়ি মেলা করবেন দিদি

শোভন চট্টোপাধ্যায়
মহানাগরিক, কলকাতা

কলকাতা নামক শহরটি নাকি আন্তর্জাতিক মানচিত্রে নেই। ক্যালকাটাও নেই। এই শহরের আর গুরুত্বই নাকি অবশিষ্ট নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় বিনিয়োগ টানার জন্য ভারতের যে তিনটি শহরে রোড-শো হবে, সেই তালিকায় দিল্লি, মুম্বই ও চেন্নাই আছে। কলকাতা নেই। কোন আহাম্মকের সিদ্ধান্ত কে জানে! নেই! কেন নেই? ভারতের চার মহানগর বলতে তো এই তিনটি শহরের সঙ্গে কলকাতার নাম একইসঙ্গে উচ্চারিত হয়। তাছাড়া রোড-শো-র (পড়ুন মিছিল) শহর বলেই তো এর বেশি পরিচিতি। তাছাড়া নস্টালজিয়া ব্যাপারটা মার্কিন প্রশাসনের প্রতিনিধিদের বিন্দুমাত্র নেই। তারা জানিয়েছেন, ব্যবসায়িক সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই শহর বাছা হয়েছে। কলকাতা যোগ্য বিবেচিত হয়নি। না, আহাম্মকরা কলকাতা যে মৃত, সেটা উচ্চারণ করেনি। আসলে ওরা শহরের মাপকাঠিতেই কলকাতাকে দেখেছে। দেশের প্রাচীন রাজধানী যে একটি শহরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক গ্রাম সেটার মর্ম বুঝতে পারেনি। অথবা সেটা বুঝেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তবে সেজন্য আপনি মন খারাপ করবেন না মেয়রমশাই। অবশ্য দিদি মুখ না ফেরালে অন্য কোনো কারণে আপনার মন খারাপ হয় না বলেই আমি জানি। এমনকী জমা জলের জন্য বিখ্যাত এই শহরের মহানাগরিককে আড়ালে সবাই জল-শোভন বলে ডাকলেও আপনি মন খারাপ করেন না। আপনার দলে দু'টো শোভন, দু'জনেই চাটুজ্যে। তাই একদা জল দফতরের মেয়র পারিষদ হয়েছেন জলশোভন। আর একবার একটা স্যুইমিং পুল উদ্বোধনে গিয়ে দিদি মজা করে যখন আপনাকে ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখ শুনেছি হাবুডুবু অবস্থাতেও আপনার মুখে হাসি এবং 'দিদি শরণং গচ্ছামি' আনুগত্য একটুও মুছে যায়নি।

যাই হোক, কাজের কথায় আসি। ভারতীয় লগ্নিকারীরা যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ করেন, সংশ্লিষ্ট রোড-শোটি তার প্রচার অভিযান। সেক্ষেত্রে এই শহর নিয়ে আমার মনে হয় আগ্রহ না দেখানোই ভালো। আপনার কী মনে হয় মেয়রসাহেব? বঙ্গে বিনিয়োগ করার লোকই কলকাতায় নেই, তায় আবার সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আমেরিকা! কিন্তু স্যার, কলকাতা তো এমনটা উপেক্ষিত ছিল না। তবে কী সত্যিই কলকাতা আর মহানগর নয়, এটা একটা নিছক গ্রাম! প্রথমে বামফ্রন্ট এবং তারপর মমতা ব্যানর্জির তৃণমূল কংগ্রেসের আন্তরিক উদ্যোগে গর্বের কলকাতা মারা গেছে!

বিনিয়োগ ব্যাপারটা গোটা রাজ্যের ব্যাপার, এটা আমি স্বীকার করি। সে কারণে আপনি যাবতীয় দায় মনে মনে দিদির দিকে ঠেলে দিতেই পারেন। কিন্তু মহানাগরিক হিসেবে কি আপনার একটু লজ্জা হচ্ছে? যদি সেই সার বস্তুটি থাকে তবে তা মুছে ফেলুন তিলোত্তমায় দ্বিতীয়বার অভিষিক্ত রাজামশাই। বরং আমি আপনাকে কিছু যুক্তি সাজিয়ে দিচ্ছি। সেসবকে এক করে কষে একটা চিঠি লিখে মার্কিন আহাম্মকদের যাকে বলে মুখে ঝামা ঘষে দিন।

আর সে চিঠিটা সাদা কাগজে নীল রঙে ছেপে বাংলায় ছড়িয়ে দিন। বিরোধী থেকে বিলিতিবাবু, সাহেব সুবো থেকে হরিপদ কেরানি সবাই পড়ে বুঝুক কথায় কথায় কলকাতার নিন্দা করা, জল জমা নিয়ে ওয়াক থুঃ করাটা কতটা বোকামি।

মনে রাখতে হবে, কলকাতার চেহারাটা একটা গামলার মতো। আর গামলায় জল জমবে না তো কি ধোসা বানানোর তাওয়ায় জমবে? এটা রবি ঠাকুরের দেশ। সিগন্যাল পোস্টেও জোড়াসাঁকোর দামাল ছেলের লেখা গান বাজে। সেখানে বর্ষার গান বাজিয়ে আমরা বর্ষা উপভোগ করি। সেই জমা জলে ইলিশ না থাকুক, বাজার থেকে বারমুডা পরে ইলিশ কিনে এনে খিচুড়ি উৎসব হয়। দিদির মতো কলকাতায় একটু খিচুড়ি আর ইলিশ মেলা করার প্ল্যানও আছে। কবে তিনদিনের বর্ষণ আর কলকাতা ওয়াটার পার্ক হয়ে যাবে সেটা গ্যারান্টি দিয়ে আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলতে পারছে না বলেই দিনক্ষণ ফাইনাল করা যাচ্ছে না।

জল জমে, জল জমে বলে যারা দিনরাত ল্যাজ নাড়ে তাদের জানিয়ে দিন, ভূগোলটা ঠিক করে পড়া না থাকলে এমনটাই হয়। আরে বাবাঃ, সেই কথাটা ভুলে মেরে দিলেন, পৃথিবীর তিন ভাগ জল। আর তারই অঙ্গ কলকাতারও তিনভাগ জল। সেই জলকে অস্বীকার করছেন কেন? বরং অপেক্ষা করুন। আগামীর কলকাতায় থুড়ি আগামীর লন্ডনে নীল সাদা রঙ করা শিকারা ভাসবে। মার্কিনবাবুরা তখন দেখতে এলে টিকিট করে দেবেন। একদম দলারে ইনকাম।

— **সুন্দর মৌলিক**

ভারতের গরিমাময় বাণিজ্যিক অতীতের পুনর্নির্মাণে হাত লাগালেন মোদী

গুরুচরণ দাশ

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরে স্থল সীমান্ত, ছিটমহল প্রভৃতি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত চুক্তিগুলি বাস্তবায়িত করে প্রধানমন্ত্রী প্রায় কাশ্মীর সমস্যার মতোই প্রাচীন এক বিতর্কিত বিষয়ে ইতি টানলেন। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের পাশাপাশি তিনি আরও অসাধারণ একটি কাজ করেছেন। এই উপমহাদেশের গরিষ্ঠাংশ দেশকে তিনি ইউরোপীয় ধাঁচের একটি 'কমন মার্কেটের' আওতায় আনার সফল উদ্যোগ নিয়েছেন। পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যায় ব্যবসা ও বিনিয়োগ এই দু'টি বিষয়ই নরেন্দ্র মোদীর কূটনৈতিক সাফল্য অর্জনের সবচেয়ে ধারালো হাতিয়ার। তাঁর চেয়ে কেউ আর ভালো জানে না যে ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নল কখনই নয়, তা নিহিত রয়েছে একথালা ভাত বা পর্যাপ্ত রুটির মধ্যেই। আর এই উপলব্ধিকে বাস্তবায়িত করতে তিনি অনুসরণ করছেন ভারতের প্রাচীন গৌরবের এক পথ যা ছিল বাণিজ্যিক সংস্কৃতি। নানান রপ্তানি দ্রব্যে ঠাসা ভারতের বাণিজ্যতরণীগুলি বিশ্বের বন্দর থেকে বন্দরে ঘুরে ঘুরে দেশের সমৃদ্ধি ঘটিয়ে তাকে শক্তিধর করে তুলত। এই বাণিজ্যিক ট্রাডিশনের মধ্যেই সুপ্ত ছিল ভারতের বিশ্ব মানচিত্রে নেতৃস্থানীয় দেশ হয়ে ওঠার কাহিনি। আপাতভাবে সীমানা চুক্তি স্বাক্ষরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি সন্দেহ নেই। এরই পাশাপাশি সম্পাদিত অন্যান্য চুক্তিগুলিও কম গুরত্বপূর্ণ নয়। আজকের দিনে ভারতের পণ্যবাহী জাহাজগুলি সিঙ্গাপুর হয়ে বাংলাদেশে পণ্য পরিবহন করে তিন সপ্তাহে। নতুন চুক্তির পর সেই সময় নেমে আসবে মাত্র এক সপ্তাহে। অভাবনীয় পরিবর্তন।

ভারতীয় সংস্থাগুলি বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ

৫০০০ মাইলের তটরেখা সম্বলিত ভারত ঐতিহাসিকভাবেই ছিল এক বিরাট বাণিজ্যিক দেশ। ইতিহাসের কোনও এক কালপর্বে এই বাণিজ্যের পরিমাণ শতাংশের হিসেবে বিশ্ববাণিজ্যের ২০ শতাংশ অধিকার করেছিল যা আজ মাত্র ২ শতাংশ। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্যের ইতিহাসে ভারতের সবসময়ই ছিল উদ্বৃত্ত বাণিজ্য লেনদেন। ঘাটতি কখনও ছিল না।

বিক্রি করবে। সীমান্তের দু'ধারে গড়ে উঠবে বিশেষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র (SEZ), যেখানে চাকরি হবে হাজার হাজার মানুষের। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের বাণিজ্য ঘাটতিও কমে আসবে। এর ফলে তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্কেত যাবে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশে যারা পরস্পরকে সন্দেহ করে, তারা বুঝবে এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের রাজনীতি করাটা কত বুদ্ধিমানের কাজ।

এ প্রসঙ্গে দু'শতাব্দীর হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের দিকে নজর ফেরালে দেখা যাচ্ছে, 'মুজিরিম' নামে তৎকালীন কেরালা অঞ্চলের এক সদাব্যস্ত বন্দরের ছবি। যেখানে ধীরে এগিয়ে আসছে সোনা বোঝাই একটি জাহাজ। এটি একদিনের কথা নয়। প্রতিদিন রোম সাম্রাজ্যের অধীন কোনও না কোনও জাহাজ দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলিতে সোনা খালাস করার পর সেখানকার উৎকৃষ্ট তুলো, মশলাপাতি ও অন্যান্য বিলাস উপকরণে বোঝাই হয়ে ইউরোপে যাত্রা করত।

মজার কথা, তখনকার ভারতীয়রা কখনই মাথা ঘামাত না রোমান জাহাজগুলিতে কী এল না এল, তা নিয়ে। যেহেতু বাণিজ্যের হিসেব-নিকেশ সোনা বা রুপোর মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে হবে তারা সে দিকেই নজর রাখত বেশি। ওদিকে তৎকালীন রোমের দিক্‌পাল সব সেনেটররা তাদের সভাকক্ষে খেদ প্রকাশ করতেন যে তাঁদের নারীরা এত বিলাসবহুল ভারতীয় প্রসাধনী, বাসন, মশলাপাতি বা মসৃণ কাপড়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে যার বিনিময়ে রোমের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্বর্ণভাণ্ডার ভারতের হাতে চলে যাচ্ছে।

শোনা যায়, দাক্ষিণাত্যের কোনও এক রাজা রোম সম্রাটের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে

তৎকালীন রোমের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘাটতির সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে পাওয়া যাবে এরও দেড় হাজার বছর পরে সেই একই অবিশ্বাস্য ঘটনার পুনরাবৃত্তি। পর্তুগীজরা বলছে দক্ষিণ আমেরিকার বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপো ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতেই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তুলনায় আধুনিক সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও সেই একই সতর্কবাণী ধ্বনিত হয়েছিল। ভারতের পোশাক-আশাক, সুগন্ধি মশলাপাতি সারা পৃথিবীর রসনার স্বাদ শুধু নয়, পরিচ্ছদের ধরনও পালটে দিচ্ছে। ভাবলে অবাক হতে হবে ইউরোপবাসীরা মাত্র সপ্তদশ শতাব্দীতেই জানল অন্তর্বাস কাকে বলে। যখন তৎকালীন ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে তৈরি নরম ও ন্যায্য মূল্যের ভারতীয় পোশাক সে দেশগুলিতে পৌঁছতে শুরু করেছে। জেনে রাখা ভাল, রাবীন্দ্রিক স্টাইলের রোমানদের বিশাল বিশাল জোব্বাগুলি কিন্তু ভারতে তৈরি কাপড় দিয়েই বানানো হত। মুলতানের ক্ষত্রী পাঞ্জাবিদের 'নিলাম বালা ছ'আনার' হরেক জিনিসের যে ডালাগুলি দীর্ঘ ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত হিমালয়ের পথ ধরে ফেরি করে বেড়াত তারা সুদূর রাশিয়া পর্যন্ত মানুষের জীবনশৈলীতে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

৫০০০ মাইলের তটরেখা সম্বলিত ভারত ঐতিহাসিকভাবেই ছিল এক বিরাট বাণিজ্যিক দেশ। ইতিহাসের কোনও এক কালপর্বে এই বাণিজ্যের পরিমাণ শতাংশের হিসেবে বিশ্ববাণিজ্যের ২০ শতাংশ অধিকার করেছিল যা আজ মাত্র ২ শতাংশ। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্যের ইতিহাসে ভারতের সবসময়ই ছিল উদ্বৃত্ত বাণিজ্য লেনদেন। ঘাটতি কখনও ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লবের ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলির উৎপাদন আমাদের চিরাচরিত হাতে বোনা (Handloom) কাপড়গুলিকে পেছনে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রযুক্তিও হয়ে পড়ল অচল। এদিকে স্বাধীনতা লাভের পরে পরেই 'আমদানি বিকল্প নীতি' (Import Substitution) অনুসরণ করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে যে প্রাচুর্যের সম্ভবনা থেকে যায় তা হয়ে রইল অধরা। এই পরিস্থিতির বদল শুরু হল ১৯৯১-এ সংস্কার চালু হওয়ার পর। আজ প্রধানমন্ত্রী মোদী সেই অতীতকেই পুনরুদ্ধার করতে চাইছেন। সেখানেই রয়েছে তাঁর Make in India শ্লোগানের ইঙ্গিত।

ইতিহাস বলছে, ভারতের ক্ষমতার পরিচয় কোনও সময়ই যুদ্ধ বিগ্রহের মাধ্যমে বিশালভাবে প্রদর্শিত হয়নি যতটা হয়েছে অন্য মোড়কে নরমভাবে পণ্য ও ধ্যান-ধারণা রপ্তানির মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত শেলডন পেলিক বলছেন, 'চতুর্থ ও দ্বাদশ শতাব্দীর সময়পর্বে ভারতের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সুদূর মধ্য এশিয়া ভূখণ্ডে। এই বিশাল অঞ্চল জুড়ে সংস্কৃত হয়ে উঠেছিল সরকারি, আদালত ও সাহিত্যের ভাষা। ঠিক যেমন লাটিন ছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপের কেন্দ্রীয় ভাষা। সমাজের বুদ্ধিজীবীরা নানান ভাষায় বাক্যালাপ করতেন, কিন্তু সীমান্ত প্রদেশগুলির সঙ্গে (অন্যান্য দেশগুলির ক্ষেত্রে) সংস্কৃতেই যোগাযোগ রক্ষা হোত। আমরা অবশ্যই শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত করে বলতে পারি না কীভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি এক দেশ থেকে আর এক দেশে বিস্তৃত হয়েছিল, তবে এটা নিশ্চিত অনুমান করা যায়, এর বৃহৎ অংশটি ছিল বাণিজ্যের হাত ধরে। তামিল সাহিত্য পাঠ করলে দেখা যায়, সমুদ্রপথের বণিকেরা সোনার সন্ধানে সুদূর জাভা অবধি যাত্রা করেছেন। ইতিহাসবিদদের ধারণায়—'ইতিহাস ভরে আছে তরবারির দাপটে দখল করা সাম্রাজ্যের কাহিনিতে। কিন্তু একমাত্র ভারতই নির্মাণ করেছিল এক উপলব্ধি অর্থে চৈতন্যের সাম্রাজ্য।

এখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল বাণিজ্যের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের ধারণা। বর্তমান সময়ে আমাদের প্রতিবেশীরা কেমন যেন সন্দিহান হয়ে উঠেছে। তারা বলছে আমরা ভারতের খুব কাছে থাকলেও ঈশ্বরের থেকে অনেক দূরে আছি—(অর্থাৎ ভারতের সেই অধ্যাত্ম ভাবনাকে তারা অস্বীকার করছে)। এই বাতাবরণেই মোদীর অর্থনৈতিক কূটনীতি এক নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে। যদি তিনি সফল হন তাহলে আবার সত্যি হয়ে উঠবে সপ্তম শতাব্দীর প্রবাদপ্রতিম পরিব্রাজক হিউ এন সাঙ-এর সেই অনবদ্য আপ্ত বাক্যটি—'পৃথিবীর দূর-দুরান্তে বসবাসকারী বিচিত্র রীতিনীতি এবং বিশ্বাসের মানুষজনও একবাক্যে একটি দেশকেই শ্রেষ্ঠ বলে সমাদর করত—তার নাম ভারত।'

এজেন্ট হওয়ার জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ৩০.০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের বকেয়া টাকা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো যাবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমার টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

— ব্যবস্থাপক

শিক্ষাঙ্গনে শ্মশানের প্রেতনৃত্য

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অতলের দিকে দ্রুত পতনশীল। এর কারণ ঐতিহাসিক। দেশ বিভাগ— উদ্বাস্তু স্রোত বাংলার শিক্ষাকে প্রথম ধাক্কায় সংকটগ্রস্ত করে। স্বাধীনতার পর থেকে বাম রাজনীতি ছাত্র- আন্দোলনকে সংগঠন বাড়াবার লক্ষ্য বলে স্থির করে। সেই

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী পদত্যাগ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ফাইল চিত্র

জঙ্গি ছাত্র- আন্দোলন শিক্ষার অপঘাত ঘটায়। বাস-ট্রাম পোড়ানো তো বটেই, এই রাজনীতির আদর্শ ছিল ঐতিহ্য বিরোধী জাতীয় শিক্ষাদর্শের পরিপন্থী। রবীন্দ্রনাথ তাদের মতে বুর্জোয়া কবি, স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুত্ববাদী— সাম্প্রদায়িক! ম্যাক্সিম গোর্কি-মায়াকভস্কি-লুসুন শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ-মোহিতলাল-তারাশঙ্করের চেয়ে বড় সাহিত্যিক। চীন আক্রমণের সময় এরা প্রকাশ্যে দেশ-বিরোধী মতামত পোষণ করেছেন— সমাজতন্ত্রী চীন আক্রমণকারী হতে পারে না। তাই ভারতই আক্রমণকারী! এরকম উদ্ভট মতামত ব্যক্ত করেছেন তারা। পাশাপাশি চীনের তিব্বত দখল, বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী তিব্বতীদের দেশ ত্যাগ, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকে তারা মার্কিন চক্রান্ত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। একবারও মনে হয়নি তিব্বত ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির আশ্রয়ে পরিপুষ্ট আর সেখানে চীনা আধিপত্য বিস্তার মোটেই দেশের পক্ষে ভালো ফল দেবে না। ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা তারা বন্ধক দিয়েছিলেন মস্কোর প্রচার ব্যবস্থার কাছে। বুদ্ধি বিবেচনায় পঙ্গু এরাই সত্তর দশকে বিদ্যা কেন্দ্রগুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে— 'চীনের চেয়ারম্যানকে আমাদের চেয়ারম্যান বলতে তাদের বাধেনি। নবজাগরণের মহাপুরুষদের নির্বিচারে জন-বিরোধী বলে তাদের মূর্তি ভাঙা চলেছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সব ভয়ঙ্কর প্রবণতার ফলে গণ টোকাটুকির মতো অদ্ভুত পরিণতি ঘটে যুব কংগ্রেসীদের উন্মত্ততায়।

এই অধঃপতনের সবটাই বামপন্থীদের নষ্ট আদর্শের কুফল বললে সবটুকু বলা হয় না। ব্যক্তিগতভাবে বহু বামপন্থী ছিলেন সুশিক্ষিত; তাদের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিই ছিল বিভ্রান্তিকর। বিদেশি আদর্শ পড়তে বুঝতে তাদের দিন গেছে— শিক্ষাঙ্গন হয়েছে ক্যাডার সংগ্রহের ক্ষেত্র! লেনিনের ভাষায় 'সর্বক্ষণের বিপ্লবী' তৈরি করার উৎকট লালসায় তারা বেশ কিছু হোলটাইমার পেলেন কিন্তু বিপ্লব হলো না। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য হারিয়েছে সম্মান। দাঙ্গা, দেশ বিভাগের ক্ষত সারেনি, কংগ্রেসী রাজত্ব ফিরে এসে শ্মশানভূমির প্রেতনৃত্য শুরু

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের অবস্থান ঘিরে ছাত্রদের হাততালি।

করেছে।

সাড়ে তিন দশকের বাম শাসনে সামান্য সুফল ফলতে পারত। বামপন্থীরা গুণ্ডাদের দ্বারা শাসন করেনি তাদের শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ স্তালিনপন্থী। তারা সর্বস্তরে অফিস কাছারি রাস্তার কারখানার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে কায়েম করার লক্ষ্যে গড়ে তুললেন এক বিচিত্র হুকুমদারি। সর্বত্র নীতি নির্ধারণ— কর্ম বিনিয়োগ ক্ষেত্রে তারা নিরঙ্কুশ হতে চাইলেন। স্কুল বা কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যাঁরা নিযুক্ত হলেন তাঁদের সিংহভাগই পার্টি সমর্থক। এইভাবে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে তারা বাংলার জনতাকে নিজেদের পক্ষে এনেছেন। এই 'জনগণতন্ত্র' আসলে জনগণকে পশুখামারে পোরার কৌশল— বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের পরিপন্থী, ভয়ঙ্কর। মধ্য মেধার শিক্ষকরা যে শিক্ষার ধ্রুব আদর্শকে রক্ষা করতে পারবেন না তা বলা নিষ্প্রয়োজন। বাম রাজত্বের শেষ দিকে একটা কথা চালু হয়--- পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন নন্দন-চত্বরের ফুটপাতে। পাশাপাশি নিযুক্ত হবার পর উপাচার্যদের আলিমুদ্দিনে টুল পেতে বসতে হয়। সিনেট-সিন্ডিকেট-ই.সি-কোর্ট সর্বত্র ছিল বামদের অবাধ বিচরণ--- একে বামপন্থীরা 'শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ' বলে তকমা দিয়েছিলেন। এসবই যে হুকুমদারির কৌশল তা বুঝতে বুঝতে চলে গেছে সাড়ে তিনটি দশক।

আর একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো বাম জমানায়। প্রাথমিক স্তরে তারা ইংরেজি পড়ানো বন্ধ করে দিলেন। এই সিদ্ধান্ত বাঙালি মেনে নেয়নি। ফলে গড়ে উঠেছে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। সরকারি শিক্ষা পঙ্গু অথর্ব হয়েছে। মধ্য মেধার শিক্ষকদের পোয়াবারো হয়েছে। তারা পার্টি মুখপত্র পড়ে, বিক্রি করে প্রধান শিক্ষকদের অপদস্থ করে, শিক্ষার ক্ষতি করে শ্রেণী সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। বাঙালির সর্বভারতীয় সম্মান ছিল তাদের ইংরেজি শিক্ষা। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হিন্দী ভাষার প্রবল প্রতাপের পাশে একারণেই আজও দক্ষিণ ভারতের কর্মপ্রার্থীরা আত্মপ্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। বাঙালি কালিদাসরা নিজেদের পায়ে কুড়ুল চালিয়ে যা করলেন তার ফল ভুগতে হলো কয়েক প্রজন্ম। সমান্তরাল ইংরাজি মাধ্যম স্কুলগুলির না আছে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি বা আদর্শ, না আছে দেশীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান। কিছু ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি না— এইসব ব্যাঙের ছাতা মার্কা ইংরেজি মাধ্যমে পড়া ছেলেরা কিছুই শিখল না। বেকার বাহিনীতে নাম লেখানো ছাড়া করার কিছু বাকি থাকল না।

বাম রাজনীতির ভস্মাধার থেকে বেরিয়ে এল তৃণমূল। ভয়ে অত্যাচারে দিশাহারা বাঙালি সমাজই সমর্থন করেছে। কিন্তু শাসন- দণ্ড হাতে পাবার পর দেখা গেল রোগ যেমন ভয়ঙ্কর ছিল রোগীর উপর প্রযুক্ত ওষুধ হলো আরও ভয়াবহ— রোগীর এখন-তখন অবস্থা! এই নতুন শাসকদের সাংস্কৃতিক মান অকল্পনীয়। মূর্খামির সঙ্গে অহঙ্কার যুক্ত হলে যা হয় তাই দেখা যাচ্ছে চারপাশে। বই লেখা উদ্বোধনে বক্তৃতায় শেক্সপীয়ার-কীটস-শেলী-বায়রনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আড্ডা দিতেন বলে জানা যাচ্ছে! পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নাকি সতীদাহ প্রথা বিলোপের আইন পাশ হয়েছিল বলে জানা গেল। সিধু-কানু ডহরে সিধুবাবু-কানুবাবু আর 'ডহর'বাবুর আত্মীয় স্বজনের খোঁজ পড়ল! বিজ্ঞাপনে জানা গেল বিরসা মুণ্ডাও সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর শহীদ! সেই সঙ্গে ভাষা ও ভঙ্গির কদর্যতায় শোভনতার সীমা হারিয়ে গেল শাসককুল। এমন কুশাসন এর আগে বাংলা প্রত্যক্ষ করেনি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে নিগ্রহ।

শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজক পরিস্থিতি। কোথাও ছাত্র সংসদের নির্বাচনের আগে

সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে পুলিশ প্রাণ হারাচ্ছেন, কোথাও কলেজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পঞ্চাশোর্ধ্ব তৃণমূল নেতা। প্রশাসনিক প্রধান বলছেন তারা নাকি ছোট ছোট ছেলে! প্রেসিডেন্সির বেকার- ল্যাবরেটরি ধ্বংস করতে আসছে ঝান্ডাধারী তৃণমূল— রক্ষা করতে বুক চিতিয়ে খাড়া থাকার শাস্তি পাচ্ছেন দুই প্রজন্মের এক কর্তব্যপরায়ণ দারোয়ান। এই অবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের গায়ে হাত তুলল ছাত্রদল— তাদের অনেকেই আবার স্থানীয় তৃণমূল নেতা! এসব ঘটনার বিবরণ দিলে লেখাটি অনেক বড় হবে। পাঠক সবই দেখছেন। আমাদের বরং তলিয়ে দেখতে হবে অন্য কিছু প্রবণতা ও মনস্তত্ত্ব।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন তিনি নাকি শিক্ষকদের মাইনে দেন! টাকাটা নিশ্চয় শিক্ষামন্ত্রীর ব্যক্তিগত তহবিল দেয় না। বলছেন উনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হিসাব পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করবেন। যে দলকে সিবিআই-এর তদন্তকারীদের চাপে হিসাব জমা দিয়ে আসতে হয় সেই দলের নেতার মতোই কথা বটে! আমরা যদি প্রশ্ন করি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চলে কীভাবে তা কি শিক্ষামন্ত্রী জানেন না? বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ করে ইউজিসি এবং বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সি। রাজ্য সরকারের অংশ সেখানে সামান্য। শিক্ষকদের পদ অনুমোদন করে ইউজিসি। প্রথম দিকে তাদের বেতনের পুরোটাই দেয় তারা, পরে রাজ্য সরকারকে দিতে হয় অর্ধেক— ম্যাচিং গ্রান্ট। এর সঙ্গে দেবার কথা দুর্মূল্য ভাতা। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রের তুলনায় এই ক্ষেত্রে প্রায় পঞ্চাশ কিস্তি কম দিচ্ছেন! এই সব খবর অবশ্য ছাত্রনেতা থাকাকালীন আর পরবর্তী সময়ে নেত্রীর ঘনিষ্ঠ থাকার সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক করতে করতে জানার কথা নয়। আর ইনটারনাল অডিট? সেটা করার জন্য বিশেষ উদ্যোগের দরকার যা তা তো নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই। এজি- বেঙ্গলের মতো সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। মাঝে মাঝেই সরকারের শিক্ষা দপ্তর হিসাব চেয়ে পাঠান— বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে হিসাব দিতে হয়। গবেষণা সংক্রান্ত হিসাব দিতে হয় দফায় দফায়— ইউটিলাইজেশনের কাগজ যথাযথ না জমা পড়লে পরের কিস্তির টাকা আসে না। অত রকম ব্যবস্থা মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর এই গর্জন একটি বিপজ্জনক প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত।

শুনতে আশ্চর্য হলেও এই সব প্রবণতার উৎসে আছে আমাদের রাজ্যের শাসক—সর্বোচ্চ আসনে যিনি প্রাচীন রানী বা সুলতানদের মতো একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করছেন তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বশাসিত সংস্থা। এ আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসনের অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই— থাকার কথা নয়। বাম শাসন সেই মূল্যবোধকে সুকৌশলে ভূমিসাৎ করে ছেড়েছে। আর এখন কী হচ্ছে? একজন প্রধান শিক্ষক মার খাচ্ছেন পাশের ক্লাবের প্রমোটার চক্রের কাছে। কারণ তিনি প্রাপ্ত সরকারি বরাদ্দ দিয়ে তাদের উদর-পূর্তির ব্যবস্থা করতে পারেননি। ভাঙড়ের এক শিক্ষিকা আহত হলেন এক কলেজের মুখ-না-দেখা 'গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানে'র ছোঁড়া জলের জগে! কোনো ক্ষেত্রেই রানীসাহেবা কোনো দোষ দেখলেন না। চিকিৎসা- বিদ্যার সেরা প্রতিষ্ঠানে মানুষের বদলে এক 'আননোন ভি-ভি- আই-পি' কুকুরের ডায়লেসিসের ব্যবস্থা নেওয়া হলো! শেষ পর্যন্ত একাজে রাজি না হয়ে পদ খোয়ালেন অভিজ্ঞ এক চিকিৎসক পরিচালক। রানী সাহেবা দেখেও দেখলেন না অথবা তাঁকে পাঠালেন বাধ্যতামূলক নির্বাসনে। এরকমই চলছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র ছাত্র-বিক্ষোভ সামাল দিতে না পেরে উপাচার্য যখন বেসামাল তখন তাঁকে বদলানোর কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশে মোবাইল হাতে শিক্ষামন্ত্রী। সেটা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িবারান্দা। এইসব বলদর্পী শক্তিকে কে বোঝাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বশাসিত; সেখানে উপাচার্য নিযুক্ত হন মাননীয় রাজ্যপাল তথা আচার্যের অনুমতিক্রমে। তিনি তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করতে পারেন। মাঝখানে মন্ত্রী বা সান্ত্রীদের কোনো ভূমিকাই নেই। থাকা উচিত নয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ছাত্ররা (এবং তাদের নেতা হিসাবে আগত মাঝ বয়সী দুর্বৃত্তরা) শিক্ষকদের উপর সুপ্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে চড়াও হলো— জামা ছিঁড়ে নিল। এক হিন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক যিনি আবার নাকি তৃণমূল ছাত্রদের নেতা— তিনি এসে বাণী ঝাড়লেন, শিক্ষকরা রাস্তার গুণ্ডাদের মতো ব্যবহার করেছেন! ওই শিক্ষক বাম ছাত্র নেতার শিক্ষাগত যোগ্যতা নাকি গভীর রহস্যাবৃত! যাইহোক, তিনি কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ নন। তাহলে কোন অধিকারে তিনি সেখানে গেলেন? আর বলিহারি শিক্ষামন্ত্রী! তিনি এত্তেলা পাঠালেন— উপাচার্য তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে আসুন, ব্যাপারটা কি? এখানে যা হলো তা সাদা ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার হরণ। সব থেকে দুঃখের কথা, মাননীয় উপাচার্য এই আদেশ মান্যও করলেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য ছিলেন, বৃটিশ আমলাদের মুখের উপর বলেছিলেন শিক্ষার স্বাধিকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশাসনের কথা, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য এখন মন্ত্রীর ডাক শুনে ছুটছেন 'বিকাশ ভবনে'। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের দাবিতে যাঁরা মার খেলেন— তাঁরাও গিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রীর সালিশি সভায়। মনে তো হচ্ছে এঁরাও প্রকৃত স্বাধিকার চান না— চান বাম আমলের কৌশলী বিদ্যাক্ষেত্র দখলের সুলুক সন্ধান। মোটকথা, সব দেখেশুনে বাম শ্রমিক আন্দোলনের একটি কলরব মনে আসছে— 'মরতে হুয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা কো--- এক ধাক্কা আউর দো'। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা চিত্র দেখে মনে হয় এ রাজ্যটিকে তুলে আনা কঠিন— অসম্ভব। সরস্বতীর কমলবনে পাগল হাতিদের উপদ্রব চলছে। চলবে? আর কতদিন চলতে দেব আমরা? ■

ঈশ্বর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায়তনকে রক্ষা করুন

দেবীপ্রসাদ রায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন শিক্ষায়তনে সাম্প্রতিক ন্যক্কারজনক ঘটনাবলীতে হতাশায় প্রায় বাক্‌রুদ্ধ এক অবসর প্রাপ্ত বয়স্ক অধ্যাপকের এছাড়া আর কিই-ই বা বলার আছে! এক শ্রেণীর দুর্মতিগ্রস্ত মানুষ তাদের প্রশ্রয়িত এবং নির্দেশিত উপায়ে যে তাণ্ডব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালাতে পারলো তা ইতিমধ্যে অবক্ষয় জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গকে কোন রসাতলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। এর দীর্ঘ পশ্চাৎপটে বহু অবাঞ্ছিত ঘটনাবলি আছে যার বেদনাদায়ক স্মৃতি থেকে মুক্তি পেতে চাওয়া পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিন কাটাচ্ছিল হতাশা ও বেদনার প্রান্তদেশে এসে। সেই সময় রাজনৈতিক পরিবর্তন কিছুটা আশার সঞ্চার করলেও অচিরেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আশা ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে— এটাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা। দেখা গেল পুরনো ক্ষমতালোলুপতা— মদের নতুন চেহারার দৃশ্যমান হওয়া। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকুক বা না থাকুক সঙ্কটময় মুহূর্তে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসীদের মনে এক পরিত্রাতা সর্বশক্তিমানের কথা এসে পড়েই। যুক্তি থাক বা না থাক কিন্তু সেই কোনো এক 'অবতার'-এর অবতরণের কাল গুনতে পারে কি আজকের বিজ্ঞান সচেতন মানুষ? তাই পরিত্রাণ ও প্রতিকারের পথ খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরই, সাধারণ মানুষকেই। আস্থাভাজন ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলিষ্ঠ বর্তমান গড়ে তুলতে হবে আমাদেরই এবং বিগত কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বছরের দুঃখময় অতীতকে মাথার মধ্যে রেখে,— ভুলে গিয়ে নয়। আর কোনো রাজনৈতিক নেতা নয়, কোনো তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নয় (সবাই তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন বা হারাচ্ছেন নির্লজ্জভাবে), কোণঠাসা সাধারণ মানুষ যারা প্রতিদিন তার জীবনে এই ধারাবাহিক দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে আসছে। তাদের অনোন্যপায় প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও দাবিই এই দুঃসহ অবস্থার ধারাবাহিক ব্যাভিচারের অবসান ঘটাতে পারে। সেটা সম্ভব আপনার আমার সবার সার্বিক স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তার কারণে দলবাজিমুক্ত (রাজনৈতিক দলবাজি এবং ধর্মীয় ভেক ধারণের দলবাজি) মানসিকতা তৈরির অপরিহার্যতা অনুভব করা এবং জীবনচর্যার সর্বক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্র যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শিক্ষাক্ষেত্রকে রাজনৈতিক প্রাপ্তির লক্ষ্যে কলুষিত করার শুরু সেই গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষার্ধ থেকে আসানসোলের এথোরা গ্রামের প্রধান শিক্ষককে দলীয় ক্যাডার দিয়ে হত্যা। তারপর প্রগতিশীল বিপ্লবীয়ানার নামে এই কলুষায়ন এই হিংস্রতার বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে নানা ভাবে। আক্রান্ত হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষায়তনগুলি, যেগুলি প্রথমাবধি শিক্ষার আদর্শকে একইমান রেখেছিল। পরিকল্পিত আক্রমণ হয়েছে কামারপুকুরে, রহড়ার অধ্যক্ষ স্বামী শিবাময়নন্দজীর নিগ্রহে, সিটি মর্নিং কলেজের অধ্যক্ষা সাধনা সরকারের নিগ্রহে এবং মৃত্যুতে, বাঁকুড়ার অধ্যক্ষ অমির কিস্কুর লাঞ্ছনায়। এ সবই হয়েছে রাজনীতি পরিচালিত ছাত্র-শিক্ষক, ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষক সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে— ওয়েবকুটা ও এবিটিয়ের ভূমিকা মনে পড়ে? সাধারণ মানুষ হতাশ হয়নি, কারণ এই শিক্ষাক্ষেত্রের দায়িত্বশীল পদাধিকারীরা অনেকেই শিক্ষাজগতের স্বাধিকার রক্ষায় প্রাণ পণ করেছিলেন। ছিলেন গোপাল সেন, ছিলেন সন্তোষ ভট্টাচার্য। ঠিক এই মুহূর্তে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিগৃহীত অসুস্থ উপাচার্যের মতো দু' একজন ছাড়া যেসব প্রজাতির শিক্ষাপদাধিকারীরা বিরল প্রায় হয়ে উঠেছেন। সরকারি কৃপালাভে বিক্রি হয়ে যাওয়া মানুষদের উপর আর কি নির্ভর করতে থাকবেন সাধারণ মানুষ?

> "ছাত্র-অসন্তোষ সব কলেজেই হয়ে থাকে। ওটা নতুন কোনো বিষয় নয়। ইফতার পার্টির জন্য টাকা চেয়ে ওরা দুদিন আমাকে ঘেরাও করে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে। তাই আমি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।"
>
> — *আনারুজ্জামান*
> *অধ্যক্ষ, মালদা কলেজ*

সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে শিক্ষার প্রতি দায়বদ্ধতার ছিটেফোঁটাও যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

(১) অবিলম্বে সমস্ত রাজনীতি কলুষিত ও রাজনীতি সক্রিয়তায় বিপর্যস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'ছাত্র নির্বাচন' বন্ধ করতে হবে— যাতে কোনো অছিলাতেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের সুযোগ সৃষ্টি হতে না পারে।

(২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের করণীয় দায়িত্বগুলিতে ছাত্র সংশ্লিষ্টতার সুযোগ বন্ধ করা। অধিক অর্থ উপার্জনের সুযোগে তৈরি

করে ছাত্রসমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে— ছাত্ররা তাই সমাজবিরোধী গুণ্ডায় পরিণত হচ্ছে। এটা বন্ধ করা দরকার।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা গৃহীত নিয়ম কানুনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই।

(৪) যে যে কারণে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে 'প্রাইভেট টিউশনরাজ' কায়েম হয়েছে সে কারণগুলি দূরীভূত করতেই হবে। কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি এখন ছাত্রভর্তির, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিভুক্তিকরণের, কোনো ক্রমে পরীক্ষা প্রহসনের ব্যবস্থা করার এবং নির্বাচন পরিচালনা করারই প্রতিষ্ঠান মাত্র হয়ে গেছে— পঠন- পাঠনের নয়।

(৫) শিক্ষক বলেন ক্লাসে ছাত্র নেই— ছাত্র বলে শিক্ষক অন্যকাজে ব্যস্ত থাকেন— ক্লাস হয় না। এই সহজবোধ্য এবং সর্বজনবিদিত কার্যক্রমের পরিবর্তন করতেই হবে সরকারকে।

(৬) সজীব ক্লাস এবং ছাত্র-শিক্ষক আন্তঃক্রিয়া ছাড়া ছাত্র মেধার আবিষ্কার হয় না, দায়িত্বশীল নাগরিকের উদ্ভব হয় না। উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেই হবে।

এই ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হলে ছাত্র এবং অভিভাবকরা অকুণ্ঠ ভাবে সমর্থন জানাবেন— গণতন্ত্রের স্লোগান সর্বস্ব মানুষ ছাড়া। স্কুল শিক্ষাকে 'প্রহসনে' পরিণত করে প্রাইভেট টিউশনের টাকা যেখানে বাধ্য হওয়া এবং তার জন্য অনৈতিক পন্থার খোঁজ করতে বাধ্য হওয়া সামাজিক ব্যাধি বাড়িয়েই তুলছে— সরকারকে তা মনে রাখতে হবে।

অভিভাবক-সহ ছাত্রদেরও মনে রাখতে হবে ধান্দাবাজ রাজনীতির লোকেরা তাদের কোন 'খাদে'র দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যে আশুতোষ মুখার্জী বাংলা তথা ভারতকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন তাঁরই জন্মের সার্ধশতবর্ষেই বাংলার শিক্ষা জগত কলঙ্কিত হচ্ছে কেন, তা আন্তরিকভাবে ভাবলে এবং তারপর করতে না পারলে কী হবে আমাদের সামগ্রিক ভবিষ্যৎ? ছাত্ররা আজ আশুতোষের সেদিনের আহ্বান মনে রাখুক, "Devote yourselves therefore, to the quiet and steady aquisition of physical, intellectual and moral habits and take to your heats the mosts–self reverence, selfknowledge, self control. These three alone lead life to sovereign power."

(লেখক বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের পদার্থবিভাগের প্রাক্তন প্রধান)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনায় কয়েকজন শিক্ষাবিদের প্রতিক্রিয়া

'দশ বছরের কার্যকালে এরকম ঘটনা দেখা যায়নি। যে ঘটনাটি ঘটেছে তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এরকম ঘটনা না ঘটাই শ্রেয়।'

—**উপাচার্য সুরঞ্জন দাস,** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'ঘটনার দিন শিক্ষামন্ত্রী যদি কোনো মন্তব্য করেন, তাতে দুষ্কৃতীরা আরোও প্রশ্রয় পাবেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে আরোও বড় আন্দোলনের পথে যাওয়া হবে।'

—**শ্রুতিনাথ প্রহরাজ,** সাধারণ সম্পাদক, ওয়েবকুটা।

'শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষক আক্রমণ এ রাজ্যে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এরা হলো ছাত্রসমাজের কলঙ্ক।'

—**অমিত রায়,** নিগৃহীত শিক্ষক, ঘাটাল কলেজ

'বর্বরের মতো আক্রমণ। মারণ আক্রমণ চালিয়েছে, তারা যে আদৌ ছাত্র নয় তা দেখেই বোঝা যায়।'

—**সুপ্রিয় চন্দ,** শিক্ষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'ঐতিহাসিক সেনেট হলে এইরকম একটি লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হননি।'

—**নন্দিনী মুখোপাধ্যায়,** শিক্ষিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

'এইরকম ঘটনা বিগত চার বছর ধরে ঘটেই চলেছে। ক্রমাগত আক্রমণে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।'

—**রোশেনারা মিশ্র,** শিক্ষিকা, কলকাতা বিদ্যালয়

'শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ধারাবাহিক সর্বনাশ শুরু হয়েছে, তার এক লজ্জাজনক ঘটনার উদাহরণ এটি।'

—**শঙ্খ ঘোষ,** কবি

'মাটিতে ফেলে এলোপাথাড়ি লাথি মারা হয়েছে।'

—**দিব্যেন্দু পাল,** প্রহৃত শিক্ষক

'শিক্ষক ও কর্মচারীদের আন্দোলনের ন্যায়, অন্যায় বিচার করার কেউ নয় ছাত্র সংগঠন।'

—**অমল মুখোপাধ্যায়,** প্রাক্তন অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ

'এমন ঘটনা নিন্দনীয় কিন্তু এই ঘটনার নিন্দায় কী আর আসে যায়।'

—**স্বপন চক্রবর্তী,** ইংরেজির ডিস্টিংগুইশড্ প্রফেসর, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

'অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা যথেষ্ট উদ্বেগের।'

—**সুকান্ত চৌধুরী,** ইংরেজির ইমিরেটাস প্রফেসর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইকবালকে পুরস্কার

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি নজরুল মঞ্চে ওয়েস্ট বেঙ্গল উর্দু অ্যাকাডেমি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'তরান-ই-হিন্দ' পুরস্কার চালু করে মহম্মদ ইকবালকে মরণোত্তর পুরস্কার দেন। পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁর হয়ে তাঁর নাতি মহম্মদ ওয়ালিদ ইকবাল। এখানেই শেষ নয়, ওইদিন মমতা ইকবালের নামে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চেয়ার প্রফেসর পদ চালুও করেন। কিন্তু তিনি জানতেনই না যে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু বিভাগটিই নেই। তাঁর ভুল ধরিয়ে দেন সাংসদ সুলতান আহমেদ। অতঃপর তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে উর্দু বিভাগ চালুর নির্দেশ দেন। ভাবতে অবাক লাগে, ইনি সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী! উল্লেখ্য, আলিয়া মাদ্রাসাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই ইকবাল? ইনি কবি, দার্শনিক ও পাকিস্তানের জাতীয় কবিও বটে। আবার ইনিই রচনা করেছেন— 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা'--- নামক গানটি। মুসলমানদের খুশি করতে কংগ্রেসি রাজত্বে এই গানটি 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে ছিল বহুল প্রচারিত। জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' ছিল তখন প্রায় ব্রাত্য।

৩০ ডিসেম্বর, ১৯৩০, কবি ইকবালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এলাহাবাদে মুসলিম লিগ অধিবেশনে ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি নিয়ে ভারতের মধ্যে বা ভারতের বাইরে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক বাসভূমি গঠনের দাবি ওঠে। সেই দাবির সমর্থনে মহম্মদ ইকবাল তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন—

"I would like to see the Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single State-Self-Government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim State appearstome to be the final desting of the Muslims at least of N.W. India."

২৪ মার্চ, ১৯৪০-এ জিন্নার সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের অধিবেশনে এহেন ইকবালের ভাষণের প্রতিধ্বনিই শোনা গিয়েছে লিগ নেতৃবৃন্দের মুখে। লিগের সেই দেশভাগের প্রস্তাবই কুখ্যাত 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত। ইকবালের স্বপ্নের পাকিস্তানই পেয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বাস্তব রূপ। সঙ্গে ফাউ পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান)।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই ইকবালকে পুরস্কৃত করে এ রাজ্যে সমর্থনে ভাটা পড়া মুসলমানদের তুষ্টিকরণ ও মন জয়ের চেষ্টা করছেন। মুসলমান ভোট যে বড় বালাই! বিগত চার বছর তো নিজে মুসলমান সাজার চেষ্টা, মুসলমানদের মধ্যে দান-খয়রাতি করেও সাধারণ মুসলমানদের মন ভেজাতে পারেননি। মূলত তাঁরা কিছুই পাননি। তাঁরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়েছেন। উল্টে তাঁদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি দেখছেন 'সিঁদুরে মেঘ'। অতঃপর মুসলমান ভোটের স্বার্থে জিন্না, সুরাবর্দীর নামে আলিয়ায় চেয়ার চালু করলে আশ্চর্য হব না।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য

গত ১৮ মে স্বস্তিকা (২০১৫) পত্রিকায় 'নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যে কংগ্রেসের দোসর কমিউনিস্টরাও'— পূরবী রায় নামক প্রবন্ধে সারথি মিত্র মহাশয়ের লেখায় কতকগুলি অসঙ্গতির কথা চোখে পড়ল। লেখকের লেখায় পেলাম ''১৯৫১ সালে সর্বভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা মাননীয় চিত্ত বসু সোভিয়েত মিলিটারি আর্কাইভ থেকে নেতাজীর বিষয়ে একটি ফাইল পান। চিত্তবাবু তার কয়েক মাস পরে রাজধানী এক্সপ্রেসে ভ্রমণের সময় রহস্যময় মৃত্যুর পরে তার ফাইলটিও রহস্যময় ভাবে চিরতরে হারিয়ে যায়, এমনটিই জানালেন নেতাজী গবেষিকা পূরবী রায়।''

অসঙ্গতিটি এখানেই যে মাননীয় সাংসদ চিত্ত বসু মারা যান ১৯৯৮ সালে। তখন তিনি বারাসাত লোকসভা আসনের নির্বাচিত সাংসদ সদস্য অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু হয়েছিল লেখকের বর্ণিত লেখার থেকে প্রায় সাতচল্লিশ বছর পরে। আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই তিনি যখন মারা যান তখন তিনি বিহার থেকে তার পার্টির একটি শ্রমিক সম্মেলন থেকে ফিরছিলেন।

শেষান্তে আরও একটি কথা, ড. পূরবী রায়ের মতো একজন প্রকৃত খাঁটি নির্ভেজাল নেতাজী প্রেমিক গবেষক কোথা থেকে একটি এরকম ভুল তথ্য পেলেন ভেবে খুব দুঃখ লাগছে।

—**হারাধন ব্যানার্জি,**
শ্রীরামপুর, হুগলি।

পোষ্টকার্ড ও এনভেলাপ

ডাকবিভাগ একটি ঐতিহ্যবাহী সরকারি জনসেবামূলক পুরনো বিরাট প্রতিষ্ঠান। এর বহু প্রকার কার্যক্রমের মধ্যে জনসাধারণের পারস্পরিক যোগাযোগের সুলভ মাধ্যম হিসাবে পোষ্টকার্ড, এনভেলাপ ইত্যাদির গুরুত্ব কম্পিউটার, ফোন প্রভৃতির যুগেও অনস্বীকার্য। কিন্তু বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়, জনপ্রিয় ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওই বস্তুগুলি বিগত কয়েকবছর যাবৎ পোষ্ট অফিসে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি ডাক বিভাগ তথা সরকারের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি, অচিরে পোষ্টকার্ড এনভেলাপ ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হোক। স্মরণীয়, চিঠিপত্র লেখার এই মাধ্যমগুলিতেই বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র,

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ মনীষীর অজস্র মূল্যবান রচনা সাহিত্যপ্রেমী লোকের এখনও আকর্ষণের বিষয় এবং ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। পোষ্টকার্ড, এনভেলাপ মামুলি বস্তু নয়, মূল্যবান দলিলের উপকরণ।

—কমলাকান্ত বণিক,
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

আনুড়ের বিশালাক্ষী মন্দির

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণ আপনার প্রকাশিত 'স্বস্তিকা' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। আপনার প্রকাশিত ১৫ জুন ২০১৫, ৪২ সংখ্যায় উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল মহাশয়ের লেখা 'আনুড়ের বিশালাক্ষী বাংলার কামাখ্যা' নিবন্ধটি পড়লাম। উক্ত নিবন্ধে শেষের দিকে লেখা আছে ''আনুড়ের কৃতী সন্তান বিনয় মুখার্জির তত্ত্বধানে ১৪০০ সালে বর্তমান মন্দিরটি গড়ে উঠেছে।'' এই তথ্যটি লেখক মহাশয় যেখানেই পেয়ে থাকুন না কেন তা সম্পূর্ণ ভুল।

১৪৩০ সালে বর্তমান মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ আনুড়ের গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী যুবকের শুভ প্রচেষ্টার ফসল।

আশা করি আপনি আপনার অনিচ্ছাকৃত ভুলটি সংশোধন করে নেবেন।

আনুড় গ্রামবাসীগণের পক্ষে—
শ্রীহারাধন মল্লিক, শ্যামল ভট্টাচার্য,
সাধন ব্যানার্জী, শ্রীঅশোক কুমার
বন্দ্যোপাধ্যায়,
তারাপদ ঘোষ।

দশাবতার কাহিনি ও কিছু প্রশ্ন

সম্প্রতি স্বস্তিকা পত্রিকায় ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার 'দশাবতার'-এর প্রথম নয়টি কাহিনির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলেছেন— 'দশাবতার কাহিনি ভারতীয় রাষ্ট্র তথা জাতীয় জীবনের ইতিহাস।' ড. সরকারের উপপত্তি অবশ্যই অভিনব; কিন্তু তাঁর পরিবেশিত তত্ত্ব ও তথ্যকে মান্যতা দিতে হলে পুরাণ-বর্ণিত বহু কাহিনি অগ্রাহ্য করতে হয়। কতিপয় উদাহরণ—

ড. সরকার বলেছেন— ভারতবর্ষে প্রথম 'বিদেশি' লুণ্ঠনকারী হিরণ্যাক্ষ দৈত্য— (বরাহ-অবতার-৩০.৬.১৪)। তাঁর অনুজ হিরণ্যকশিপু ভারতে রাজত্ব স্থাপনকারী প্রথম 'বিদেশি' শাসক (নৃসিংহ-অবতার ২৮.৭.১৪)। অনুগামী সহ খাইবার গিরিপথ দিয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, পুরাণ বলেছে— দৈত্য ও দানব সবাই দেবতাদের বৈমাত্রেয় ভাই; মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তাঁর পত্নী অদিতি, দিতি ও দনুর গর্ভজাত পুত্রদের যথাক্রমে দেবতা, দৈত্য ও দানব বলা হয়। কশ্যপের ওই তিন পত্নী প্রজাপতি দক্ষের দুহিতা। হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু কশ্যপ ও দিতির পুত্র। তাঁরা বিদেশি হলে ওঁদের পিতা-পিতামহ সবাইকে বিদেশি বলতে হয়।

আধুনিক 'গণ্ডোয়ানা ল্যান্ড' তত্ত্ব মতে এককালে ভারতভূখণ্ড ও আফ্রিকা ভূখণ্ড সংযুক্ত ছিল; পরবর্তীকালে, ভূখণ্ড দুটি বিযুক্ত হয়ে যায়। ড. সরকার বলেছেন— 'রাক্ষস' নামে আফ্রিকার এক জাতি 'সম্ভবত' ওই বিযুক্তির ফলে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে চলে আসে এবং ক্রমে সেখানে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়--- (মৎস্যাবতার ২৮.৪.১৪)। পক্ষান্তরে, পুরাণ বলেছে— রাক্ষসদের মূল পিতা মহর্ষি পুলস্ত্য। রামায়ণ মহাভারত মতে রাক্ষসরা ভারতের অনার্য অধিবাসী (দ্রঃ 'পৌরাণিকা'--- অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

'মৎস্যাবতার' পর্যালোচনায় ড. সরকার বলেছেন— 'মৎস্য' অর্থে মাছ নয়, স্বচ্ছন্দে জলে চলাফেরা করতে সক্ষম ভারতের নৈর্ঋত অঞ্চলে বসবাসকারী একটি বিশেষ 'জলচল' জাতিকেই বোঝায়। ওই কারণে, কিংবা 'হয়তো' ওই গোষ্ঠীর কোনো নেতার নাম ছিল 'মৎস্য', তাই ওদের 'মৎস্য' বলা হোত। এখানে একটি কথা। 'জলচল' শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। জলে চলাফেরায় স্বচ্ছন্দ কোনো মানবগোষ্ঠীকে জলচল বলা চলে না; এমনকী জলচরও নয়।

পৌরাণিক 'দশাবতার' কাহিনির নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার '...ধর্মসংস্থাপনার্থায়ঃ সম্ভবামি যুগে যুগে' (৪.৭.৮) ভিত্তি করে ড. সরকারের ব্যাখ্যা নতুন ভাবনার পরিচয় বহন করে এবং তা অবশ্যই বিতর্কনীয়। তবে তা নিয়ে বিতর্ক নিরর্থক। কারণ, এসব ক্ষেত্রে বিতর্কশেষে কোনো মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। তাই, শুধু গুটিকতক প্রশ্ন রাখছি।

ড. সরকার বলেছেন— (১) সেই প্রাচীনকালে মৎস্য ও রাক্ষসদের মধ্যে যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল, শ্রীরামচন্দ্রের রাবণ নিধনে তার সমাপ্তি ঘটে; (২) সেই সময় ওই মৎস্যদের নাম ছিল 'বানর'; (৩) বানর-প্রধান হনুমান নৌকাযোগে লঙ্কায় গিয়েছিল; (৪) শিবাজীর 'মাওলী' জাতি ওই মৎস্যদের উত্তরপুরুষ ('মৎস্যাবতার')। ওই সকল তত্ত্ব/তথ্যের ভিত্তি কী?

ড. সরকার 'সমুদ্রমন্থন' উপাখ্যান প্রসঙ্গে বলেছেন— যৌথ উদ্যোগে ওই মন্থনের ফলে প্রাপ্ত সম্পদসমূহ দেব ও দৈত্যরা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল--- ('কূর্মাবতার' ২৬.৫.১৪)। কথাটি ঠিক নয়। দেবতারা ছল-চাতুরী করে সব কিছুই হাতিয়ে নিয়েছিল— (দ্রঃ মহাভারত-আদিপর্ব, অধ্যায় ১৮-১৯)। অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী 'কথা অমৃতসমান ১' গ্রন্থে দেবতাদের ওই তঞ্চকতার পৌরাণিক বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলেছেন।

ড. সরকার বলেছেন পরশুরাম 'সহস্রার্জুন'-কে হত্যা করেছিলেন--- (পরশুরাম' ১০.১১.১৪)। পরশুরাম যাঁকে হত্যা করেছিলেন তাঁর নাম 'কার্তবীর্যার্জুন'।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা-৬০।

মারনাইয়ের প্রমথেশ্বর জিউ

ড. বৃন্দাবন ঘোষ

অতীতে ডাউক, নাগর, বীণা, শ্রীমতী ও সুই নদীর তীরে উত্তর দিনাজপুর জেলার জমিদার বাড়িগুলি গড়ে উঠে। আর সেই সব জমিদারদের বাড়িতে বাড়িতে তৈরি হয় মন্দির। সাধারণত জমিদাররা ভোগ বিলাসিতায়, পুত্রকন্যার বিবাহে, মাতাপিতার শ্রাদ্ধে, দান ধ্যানে, পূজা পার্বণে এবং মন্দির প্রতিষ্ঠায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁদের গড়া জেলার মন্দিরগুলির কারুকার্য খুবই অপরূপ। দেশে জমিদারি প্রথা অবসানের ফলে তাঁদের সেই মন্দিরগুলি জরাজীর্ণের কবলে পড়ে। সেই কবল থেকে মারনাই গ্রামের জমিদার পালচৌধুরীদের প্রমথেশ্বর মহাদেব জিউও বেরিয়ে আসতে পারেনি।

জমিদার মহেন্দ্র নারায়ণ পালচৌধুরীর আদি বাড়ি মালদহ জেলার আলালে। তাঁর উপাধি ছিল পাল। তাঁরা ছিলেন তিলি। বৃটিশ সরকার তাঁকে জমিদারি পরিচালনার জন্য চৌধুরী উপাধি দেন। সেই সময় মারনাই গ্রামের নুনিয়ারাও বেশ বিত্তশালী ছিলেন। তাঁরা নুনের ব্যবসা করতেন। জমি জায়গাও প্রচুর ছিল। নুনিয়া পরিবারের বাবুরাম দে নিজের জমিতে অধিক ফসল লাভের জন্য শস্যদেবতা শিবের উপাসনা করতেন। তাই তিনি ১৩২৫ বঙ্গাব্দে ২৫ চৈত্র তাঁর বাটিতে

পরম্পরা

ভূতেশ্বর মহাদেব জিউ নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের নামে পাঁচশো বিঘে জমি দেওয়া হয়। তখন এই মন্দিরে শিব চতুর্দশী ও চৈত্র সংক্রান্তিতে খুব নিষ্ঠা ও ধুমধাম সহকারে শিব পুজো করা হোত।

জমিদার শশিভূষণ পালচৌধুরী খুব জেদি পুরুষ ছিলেন। তাই তিনি এক বছর পরে ১৩২৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির দিনে তাঁর বাসভবনের অনতিদূরে প্রমথেশ্বর মহাদেব জিউ নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সুদূর শান্তিপুর থেকে দক্ষ শিল্পী এনে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের অনুকরণে প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চতার এই মন্দির নির্মাণ করান। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। তবে তার পূর্বে ও পশ্চিমে দু'টি দরজা রয়েছে। সমতল থেকে কয়েকটি সিড়ি বেয়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠতে হয়।

চারপাশের বারান্দার বেশ মোটা ইটের বারোটি স্তম্ভের উপরে স্থাপিত হয় টালির ছাদ। এই টালির ছাদের নীচে দেওয়া জুড়ে হয় শাল কাঠের কড়ি। আর এই বারোটি স্তম্ভের পাশে যুক্ত করা হয় ছোট ছোট গোলাকার ইটের বারোটি কারুকার্যখচিত স্তম্ভ।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

প্রতিকপি ১০ টাকা

এই ধরনের ছোট গোলাকার ইট জেলার অন্য কোনো মঠ মন্দিরে দেখা যায়নি। দোতলার ছাদের চার কোণে স্থাপন করা হয় চারটি চূড়া। এই চূড়ার মধ্যস্থলে বেড়ে ওঠা গম্বুজের চার দেওয়ালের উপরে খোদিত আছে জমিদারি স্টাইলের দরজা।

তিন তলায় গম্বুজের উপরে স্থাপিত আছে মন্দিরের সবচেয়ে উঁচু চূড়া, যা বহু দূর থেকে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই চূড়ার উপরে স্থাপিত ছিল মূল্যবান রুপোর ছাতা। চূড়ার চার পাশে স্থাপন করা হয় আরও চারটি চূড়া। চূড়াগুলির উপরে স্থাপিত ছিল রুপো ও ব্রোঞ্চ দিয়ে তৈরি বাঘের মূর্তি। চূড়াগুলির কারুকার্য খুবই সূক্ষ্ম।

মন্দিরের মেঝের উপর শ্বেতপাথর বসানো ছিল। গম্বুজের তলদেশে নীল ও লাল রঙের ফুল ও লতাপাতার নকশা অঙ্কিত আছে। তাছাড়াও একতলা ছাদের একবারে নীচে সামনের দেওয়ালে প্রস্ফুটিত পদ্মফুল খোদিত রয়েছে। এই সব নকসা দর্শকদের নয়নযুগলকে আজও দারুণভাবে আকৃষ্ট করে থাকে। তখন এই মন্দির নির্মাণে আশি হাজার টাকা ব্যয় হয়। মন্দিরে একটি রুপোর তৈরি শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাথরের উপরে খোদিত শ্লোকটি মন্দিরের গাত্রদেশে পরিলক্ষিত হয় :

ভর্ত্তা যস্যা উপেন্দ্রঃ সুরপতি সদৃশো মালদহান্তরস্থে
বাসন্তী নাম্না গোপীরমা যা প্রথিত জনপদে মারনায়ৌ
সংক্রান্তিকালে বঙ্গাব্দে শত্রু পক্ষানল শশধর মে মেষ
চক্রে সা সংপ্রতিষ্ঠাং ভবভবন হরস্যাষ্ট মূর্ত্তেঃ শিবস্য।

উক্ত শ্লোকে উল্লেখ করা হয় যে মালদহের প্রান্তে মারনাই নামক প্রসিদ্ধ জনপদে বাস করেন গোপীরমা, যার স্বামী উপেন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্রের মতো। শ্লোকের তৃতীয় পংক্তির শশধর (১), অনল (৩), পক্ষ (২) ও শত্রু (৬) এই চারটি শব্দের দ্বারা ১৩২৬ সংখ্যাটিকে চিহ্নিত করা হয়। তিনি অর্থাৎ গোপীরমা ১৩২৬ বঙ্গাব্দের মেষ সংক্রান্তির দিনে শিবের ভবনে অষ্টমূর্তির শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

তার মাথার উপরে স্থাপিত ছিল একটি পঞ্চমুখী নাগমূর্তি। আড়াই কেজি রুপো দিয়ে এই দু'টি মূর্তি তৈরি করা হয়। এই দু'টি মূর্তিই মন্দির থেকে চুরি হয়। তবে মন্দিরের সেদিনের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি আজও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চুরি হয় মন্দিরের মূল দরজার সামনে শিকলে ঝুলানো বিশাল ঘণ্টাও। এই ঘণ্টা রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বেজে উঠত। তার আওয়াজ শুনে গ্রামের লোকেরা মন্দিরে আসতেন। দুপুরে মন্দিরে পুজো হলে বহু লোক তার প্রসাদ পেতেন।

মন্দিরের নামে পাঁচশো বিঘা জমি ছিল। শিব চতুর্দশী ও চৈত্র সংক্রান্তিতে জাঁকজমক সহকারে পালন করা হোত। মেলা বসত। বহু মানুষের সমাগম ঘটত। বহু ইংরেজও এই মন্দির দেখতে আসতেন। আজও এই মন্দিরে বহু মানুষ পুজো দিয়ে থাকেন। কয়েক বছর পূর্বে প্রচণ্ড খরা হলে বৃষ্টির কামনায় গ্রামের মানুষ পুজোর আয়োজন করেন। সেই পুজোয় প্রত্যেক ভক্ত একশো একটি করে বেলপাতা দিয়ে পুজো দেন। কথিত আছে নাকি তারপরেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়। আজও এই মন্দিরে কেউ জুতো পরে উপরে উঠতে সাহস করেন না।

এই ধরনের মহামূল্যবান কারুকার্যখচিত মন্দির উত্তর দিনাজপুর জেলায় আর দেখা যায় না। বিহারের মুঙ্গেরের ভূমিকম্পের সময় এই মন্দিরও কম্পিত হয়ে ওঠে এবং একটুখানি মাটিতে বসে যায়। জমিদারি চলে যাবার পর দিনে দিনে পালচৌধুরীদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় মন্দিরটি আর সংস্কার হয়নি। জরাজীর্ণের কবলে পড়ে, গাত্রদেশ থেকে খসে পড়ে ইট চুন বালির কারুকার্যময় গাঁথুনি। দেখে ভীষণ কষ্ট লাগতো।

তার সেই দুরবস্থা দূর করার জন্য এগিয়ে আসেন প্রবন্ধকার নিজেই। প্রবন্ধকার এবং মারনাই জমিদার বাড়ির বংশধর শ্রীঅমিয় পালচৌধুরীর উদ্যোগে জরাজীর্ণ প্রমথেশ্বর মহাদেব জিউয়ের সংস্কারের জন্য চল্লিশ জন মানুষের স্বাক্ষর করা একটি আবেদন পত্র মারনাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে দেওয়া হয়। প্রবন্ধকারের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের কাছে এই মন্দির অধিগ্রহণের জন্য ২০০৬ সালের ১ জুন এবং ২০০৯ সালের ৩০ জানুয়ারি আবেদন করে। প্রবন্ধকার এই ব্যাপারে বেশ কয়েক বার রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সম্পাদক সুকুমার সামন্তের সঙ্গে কথাও বলেন। তার ভিত্তিতে হেরিটেজ কমিশন থেকে ২০১০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এই মন্দির পরিদর্শন করা হয়।

এই মন্দির পরিদর্শনের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে প্রবন্ধকার রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সম্পাদক সুকুমার সামন্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ জানান। তারপরেই সেখানে সুকুমার সামন্ত জানিয়ে দেন যে তাঁরা খুব শীঘ্রই এই মন্দির সংস্কারের কাজে হাত দেবেন। আটাশ লক্ষ টাকা সংস্কারের জন্য অনুমোদন করা হয়। ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন এই মন্দির সংস্কারের কাজ শুরু করে। স্থাপত্য বা শিল্পনিদর্শনগুলিকে অবিকৃত রেখে সংস্কারের কাজ চলছে। সংস্কার হলে গোটা এলাকা উপকৃত হবে। সঙ্গে সঙ্গে জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। বহু পর্যটকের আগমন ঘটবে। ■

শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে সাহিত্য-সম্রাট

১৮৮৪ সালের ৬ ডিসেম্বর। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শোভাবাজারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধরলাল সেনের বাড়িতে এসেছেন। অধরলাল ছিলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত। তাঁর বাড়িতে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও তখন উপস্থিত।

অধরলাল বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন, 'ঠাকুর, ইনি ভারি পণ্ডিত। অনেক বইটই লিখেছেন। আপনাকে দেখতে এসেছেন। এঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

ঠাকুর হাসিমুখে বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বঙ্কিম! তুমি আবার কবে ভাবে বাঁকা গো!'

বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন, 'সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।'

বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনি প্রচার করেন না কেন?'

—ঈশ্বরের আদেশ না হলে প্রচার হয় না। ঈশ্বর নির্দেশ দিলে তবেই লোকশিক্ষা হয়। তা না হলে লোকে তোমার কথা শুনবে কেন? সাধন করে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়। নইলে প্রচার হয় না। আমার নিজের শোবার জায়গা নেই, আমি শঙ্করাকে ডাকব?

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন, 'কতো বই লিখেছ, বল তো মানুষের কর্তব্য কী? কী সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে!

বঙ্কিমচন্দ্র পরকাল সম্বন্ধে জানতে চাইলে ঠাকুর বললেন, 'যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ পরকাল আছে। জ্ঞানলাভ হলে পরকাল আর থাকে না। সেদ্ধ করা ধান পুতলে কি গাছ হয়!

বঙ্কিমচন্দ্র হেসে বললেন, 'আগাছাও কি গাছ?'

—যিনি জ্ঞানী তিনি আগাছা নন। যিনি ঈশ্বর-দর্শন করেছেন, তাঁর প্রকৃত জ্ঞান হয়েছে, তিনি জ্ঞানী। পাকা হাঁড়ি

ভেঙে গেলে কুমোর ফেলে দেয়, কিন্তু কাঁচা হাড়ি ভেঙে গেলে ফের নতুন করে গড়ে। মানুষের যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ততক্ষণ তার মুক্তি নেই; সংসারেই তাকে ফিরে আসতে হবে। জ্ঞানী মায়াকে পেরিয়ে যায়। (থেমে) দেখ, শুধু পাণ্ডিত্যে কোনো লাভ নেই, যদি বিবেক বৈরাগ্য, ঈশ্বর-চিন্তা না থাকে। চিল আর শকুন অনেক উঁচুতে ওঠে, কিন্তু ওদের নজর থাকে ভাগাড়ের দিকে। পণ্ডিত অনেক পড়াশুনো করেছে কিন্তু তাঁর নজর টাকা পয়সা, বিষয় সম্পত্তির দিকে। আর যে ঈশ্বর চিন্তা করে, বিষয় তার কাছে বিষ। হাঁসের সামনে একবাটি দুধ রাখো, হাঁস জল ত্যাগ করে শুধু দুধটুকু খাবে। হাঁস সোজা চলে যায়, তেমনি ভক্ত ঈশ্বরের চিন্তাই করে, অন্য কিছু চিন্তা করে না।'

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'কিন্তু আগে তো পড়াশুনো করতে হয়। জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানবো কী করে?

—না, আগে ঈশ্বর, তারপর সৃষ্টি। তুমি অত জগৎ, সৃষ্টি, সায়েন্স-ফায়েন্সে যাচ্ছ কেন? তোমার দরকার একটা আম। আম বাগানে এসেছ আম

খেয়ে চলে যাও। কার বাগান, কত আম গাছ আছে, কত আম ফলেছে সেসব খবরে দরকার কী?

পরমহংসদেব এক মুহূর্ত থেমে বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে এক পলক তাকিয়ে সহাস্যে বললেন, 'দেখ বাপু, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। বালকের মতো বিশ্বাস করলে ঈশ্বর লাভ হয়। যে-মানুষ অসরল, যার মনে কপটতা থাকে সেয়ানা বুদ্ধি থাকে, তার ঈশ্বর লাভ হয় না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, ব্রাহ্ম যে ঈশ্বর চিন্তায় ব্যাকুল, সে ঈশ্বর লাভ করবে। ব্যাকুলতা না থাকলে ঈশ্বর লাভ হয় না।

চিন্তাক্লিষ্ট সাহিত্য-সম্রাট ঠাকুরকে প্রণাম করে আস্তে আস্তে বিদায় নিলেন।

সঙ্কলক : নির্মল কর

সেনাপতি কঙ্ক

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। মোগলদের কাছ থেকে তিনি অনেক দুর্গ জয় করেন। এরকম পুরন্দর নামে তাঁর একটি দুর্গ ছিল। একবার হলো কী— ঔরঙ্গজেব সেনা পাঠিয়ে সেটি দখল করে নিল। তাতে শিবাজীর বড় ক্ষতি হয়ে গেল। দুর্গ তো গেলই, সেই সঙ্গে অনেক টাকাও জরিমানা দিতে হলো। ভীষণ অর্থকষ্টে পড়লেন শিবাজী। মন্ত্রীদেরও খুব চিন্তা, এখন রাজকার্য কী দিয়ে চলবে? জীজামায়েরও চিন্তায় ঘুম নেই।

একদিন সন্ধ্যেবেলা জীজামা দুর্গের চাতালে বসে এসবই ভাবছেন। সেই সময় পরিচারিকা এসে খবর দিল— একজন ফকির এসেছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। জীজামা একটু অবাক হলেন। এই ভর সন্ধ্যেবেলা কোন ফকির এলো? ছুটে গিয়ে দেখলেন কালো কাপড় পরা একজন ফকির দাঁড়িয়ে আছে। মুখ ভর্তি দাড়ি, সেটাও কালো কাপড়ে ঢাকা। ফকির জীজামাকে প্রণাম করে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল— মা আমি ফকির, ভিক্ষা করে বেড়াই। রাজা মহারাজারা অনেক অর্থ আমাকে দান করে। আমার তো অর্থ কোনো কাজে লাগে না তাই এগুলো আমি শিবাজী মহারাজকে দিতে চাই। এই বলে সে একটি ঝোলা জীজামায়ের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখলো। কিন্তু জীজামা তা কিছুতেই নিতে চাইলেন না। ফকির অনেক অনুরোধ করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে জীজামা তা গ্রহণ করলেন।

তারপর একমাস কেটে গেছে। ফকিরের কথা সবাই ভুলে গেছে।

এমন সময় একদিন সেই ফকির আবার এসে হাজির। সঙ্গে পয়সার ঝোলা। এইবার কিন্তু জীজামায়ের সন্দেহ হলো। ফকির চলে যেতেই একজন সেপাইকে নির্দেশ দিলেন ফকিরকে অনুসরণ করতে।

সেপাই ফিরে এসে খবর দিল ফকির কাছেই এক জঙ্গলে ঢুকেছে। জীজামায়ের বুক কেঁপে উঠল। শত্রুপক্ষের কেউ নয়তো? তাকে ধরে আনার নির্দেশ দেওয়া হলো। সেপাইরা গিয়ে ফকিরকে ধরে নিয়ে এলো। কালো কাপড়, দাড়ি একে একে খুলে দেওয়া হলো তার সব ছদ্মবেশ। এবার বেরিয়ে পড়ল ফকিরের আসল রূপ। আর তা দেখে সবার চক্ষু চড়কগাছ। এ কে? এ যে সেনাপতি কঙ্ক!

কঙ্ক শিবাজীর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি। জীজামা জিজ্ঞেস করলেন— সেনাপতি আপনি এই ছদ্মবেশ কেন ধরেছেন? সেনাপতি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর হাতজোড় করে বললেন— মা, মহারাজের খুব অর্থকষ্ট চলছে। তাই মাইনে বাবদ রাজকোষ থেকে যে অর্থ আমি পাই তা মহারাজকে দিতে চেয়েছি। কিন্তু আমি জানি মহারাজ তা কিছুতেই নেবেন না। তাই আমি...। সেনাপতির কথা শেষ হল না। তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

শিবাজী দুর্গের ছাদ থেকে এতক্ষণ সব দেখছিলেন। এবার তিনি দৌড়ে নীচে নেমে এলেন। জড়িয়ে ধরলেন তাঁর প্রিয় সেনাপতিকে। বললেন— কঙ্ক, আমি নেব, তোমার ভালবাসার দান আমি নেব।

মনীষী কথা

শ্রীনিবাস রামানুজন

ভারতের আধুনিক গণিতচর্চায় এক অত্যাশ্চর্য প্রতিভা শ্রীনিবাস রামানুজন। জন্ম ১৮৮৭ সালের ২২ ডিসেম্বর। তামিলনাড়ুর ইরোড শহরে। বাবার নাম কপ্পুস্বামী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, মা কোমলতাম্মল। ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হতদরিদ্র পরিবার। রামানুজন খুব ছোট বয়সেই কঠিন কঠিন অঙ্ক সহজেই সমাধান করে দিতেন। অতি কষ্টের মধ্যে তিনি পড়াশুনা করেছেন। পরবর্তীতে গণিতের উপর তার বহু গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ সালে তিনি কেম্ব্রিজের ফিলোজফিক্যাল সোসাইটিতে ফেলো নির্বাচিত হন। আশুতোষ মুখার্জির পর ভারতের গণিতচর্চায় রামানুজনই ছিলেন অগ্রদূত। ১৯২০ সালে মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হন।

প্রশ্নবাণ

১. বেদের আরেক নাম কি?
২. পুরাণ কয়টি?
৩. অর্থশাস্ত্র কে রচনা করেন?
৪. শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত কে সংকলন করেন?
৫. পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা কে?

উত্তর : ১। শ্রুতি ২। ১৮টি ৩। কৌটিল্য ৪। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৫। বিষ্ণু শর্মা।

ছবিতে অমিল খোঁজ

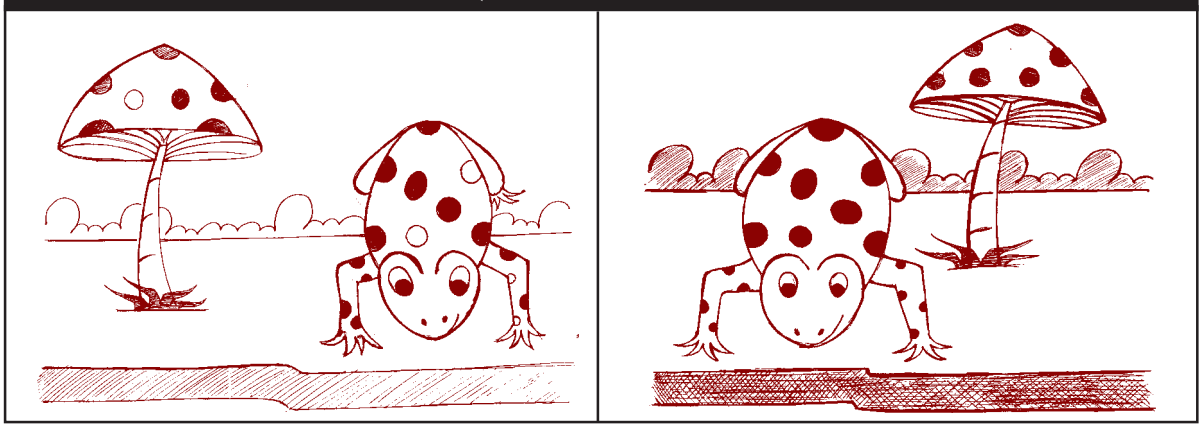

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ক ম তা ল
(২) সী ল লা ত

১৩ জুলাই সংখ্যার উত্তর
(১) রংমশাল (২) দেবাদিদেব

উত্তরদাতার নাম
প্রীতম দে, বাঁকুড়া
প্রীতিকণা রায়, কলকাতা-৬

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) কা ণী আ শ বা
(২) ক চ ব ক্ষা র

১৩ জুলাই সংখ্যার উত্তর
(১) হতচকিত (২) দূরদর্শন

উত্তরদাতার নাম
রাহুল দেবনাথ, নব বারাকপুর, উঃ ২৪ পরগণা
শিবানী সরকার, দুর্গাপুর, বর্ধমান।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

মিলির মাদার্স ডে

সুস্মিতা বিশ্বাস

আজকাল 'মাদার্স ডে' পালন করার হুজুকটা খুব উঠেছে। 'মাদার্স ডে' মানেই মায়ের জন্য ছেলে-মেয়েরা ঘটা করে উপহার কেনে কিংবা বিভিন্ন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ঘটা করে এই দিনটি পালন করা হয়। মিলি ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে এবং শুনে আসছে 'মাদার্স ডে' পালনের ঘটা। দিনটি 'মাদার্স ডে' হিসাবে পালন করা হয় জানলেও কিন্তু পালন করার কারণটা কী সেটা এখনও জেনে উঠতে পারেনি মিলি। সবার দেখাদেখি মিলিরও ইচ্ছা করে ঐ দিনটাতে মায়ের জন্য কিছু একটা উপহার কিনতে।

মিলি নিতান্তই দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। তার বাবা খুবই অসুস্থ। একেবারে শয্যাশায়ী। মা লোকের বাড়ি কাজ করে তাদের সংসার চালায় এবং তাকে লেখাপড়াও শেখায়। গত বছর সে সবার দেখাদেখি 'মাদার্স ডে'-র দিন তার জমানো টিফিনের টাকা দিয়ে মায়ের জন্য একটা ছোট্টো পার্স কিনেছিল। সবাই যেমন তাদের মায়েদের উপহার দিলেই তাদের মায়েরা তাদের জড়িয়ে ধরে আদর করে ঠিক তেমনি সে ভেবেছিল এই উপহারটা তার মা পেয়ে খুব আনন্দ পাবে এবং তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করবে। কিন্তু তার ভাবনাটা মিথ্যা হয়ে গেল। সে তার মাকে উপহারটা দিয়ে বললো 'হ্যাপি মাদার্স ডে মা...।' তার মা লেখাপড়া জানেন না, তাই তিনি এটাও জানেন না 'মাদার্স ডে'-টা কি? উপহারটা পাওয়ার পরে মা মনে মনে খুশি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেটা মিলির সামনে প্রকাশ না করে রাগ রাগ মুখ করে মিলিকে প্রশ্ন করলো— সে এত টাকা পেল কোথায়? মিলি তখন বললো 'টিফিনের পয়সা জমিয়ে তোমার জন্য এটা কিনেছি।' মিলির মা তখন বললো, 'এত টাকা দিয়ে এই জিনিসটা কেনার কী দরকার ছিল, ওই টাকা দিয়ে তো নিজের জন্য খাতা পেন তো কিনতে পারতিস বা ওই টাকাটা আমাকে দিলে আমি তোর বাবার একদিনের ওষুধ কিনতে পারতাম।' মিলির মনটা তখন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

তাপস স্যারের বাংলা ক্লাসে মিলি যেন কেমন মনমরা ও অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল। স্যার তাকে দেখে ডেকে তার অন্যমনস্কতার কারণ জানতে চাইলেন। মিলি প্রথমে কিছু বলেতে চাইছিল না, কাঁদো কাঁদো মুখ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। স্যার তার বাড়ির পরিস্থিতির কথা জানতেন আর তার মন খারাপের কারণ কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন হয়তো। কারণ প্রতি বছর স্কুলে 'মাদার্স ডে' প্রোগ্রামে সবাই তাদের মায়েদের হাতে কিছু না কিছু উপহার তুলে দেয়। কিন্তু মিলির পক্ষে সেটা সম্ভব নয় বলে ওই অনুষ্ঠানে সে অংশগ্রহণ করে না। স্যার তাকে না বকে তার পাশে এসে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'মন খারাপের কারণটা জানতে পারলে মন ভালো করে দেওয়ার একটা কথা বলবো।' মিলি খুব সঙ্কোচ বোধ করছিল কথাটা বলতে। স্যার সেটা বুঝতে পেরে বললো ক্লাসের শেষে আমার সঙ্গে দেখা করো। মিলি যথারীতি ক্লাসের শেষে স্যারের সঙ্গে দেখা করলো। মিলির মুখটা দেখে মনে হচ্ছিল তখনও সে কিছু ভাবছে। স্যার প্রথমেই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা কেমন আছেন?' মিলি বললো ভালো। স্যার কিছু বলার আগেই মিলি প্রশ্ন করলো— 'স্যার, মাদার্স ডে কেন হয়? সবাই প্রতি বছর এই দিনটাতে মাকে কিছু না কিছু উপহার দেয়। আমি কোনো বছর কিছু দিতে পারি না, তাও গত বছর মাকে একটা উপহার দিয়েছিলাম, মা খুব রাগ করেছিল। হাজার একটা প্রশ্ন করছিল। এত টাকা কোথায় পেলাম? কেন এটা কিনলাম? মাকে উপহার দিলেও মা রাগ করে তাহলে মাকে কী দেব কিছু বুঝতে পারছি না।' স্যার তখন তাকে বললেন— 'মাদার্স ডে বলে আলাদা করে কোনো দিন হয় না। বিদেশিরা নিছকই একটি দিনের নাম দিয়েছে 'মাদার্স ডে' এবং ওই দিনটা মায়েদের দিবস হিসাবে পালন করে তারা। ওই একদিন ছাড়া তারা মায়ের কোনো খোঁজখবর রাখে না। আর আমরা বোকা বাঙালিরা বিদেশিদের দেখে দেখে 'মাদার্স ডে' পালন করি। আসলে আমাদের মায়েদের কী আলাদা করে দিবস হয়, না হতে পারে। মায়েরা যখন আমাদের ভালোবাসেন আদর করেন তখন কী দিন-ক্ষণ-তারিখ দেখে করেন? তাই মাকে ভালোবাসতে গেলে কোনো দিন দেখার প্রয়োজন নেই। মায়ের জন্য যদি কিছু করতে ইচ্ছা করে তাহলে তা সেই মুহূর্তে কর। আর এমন কিছু কর যেটা তোমার সাধ্যের মধ্যে। অন্যের দেখে কিছু করার চেষ্টা করো না। মায়ের জন্য যদি কিছু করতে হয় তাহলে সেটা মন থেকে করো। স্যারের কথাগুলো শুনে মিলি একটু আশ্বাস পেল। স্যার তখন তার হাতে একটা স্লেট- পেন্সিল দিয়ে বললেন— এটা নাও আর আজ থেকে মাকে লেখাপড়া শেখাও, দেখবে মা খুব আনন্দ পাবে আর তোমাকে বকবেও না।

মিলি আনন্দ সহকারে স্লেট পেন্সিল নিয়ে ছুটির শেষে বাড়ি গেল। মাকে স্লেট-পেন্সিল দেখিয়ে বললো— এই দেখ মা তোমার জন্য কী এনেছি, আর আজ থেকে আমি তোমাকে এটা দিয়ে লেখাপড়া শেখাব। এই শুনে মিলির মা খুব আনন্দিত হলো এবং মিলিকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করতে লাগল। মিলির তখন মনে হলো তার তো প্রতিদিনই মাদার্স ডে।

প্রতিবাদের আড়ালে চক্রান্ত

অতিথি কলম

সন্দীপ সিং

পুনের স্বনামধন্য ফিল্ম ও টেলিভিশন সংস্থায় (এফ টি আই আই) গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রবীণ অভিনেতা গজেন্দ্র চৌহানের নিযুক্তিকে বাতিল করার দাবিতে ছাত্রদের যে বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে তাতে তথ্যাভিজ্ঞমহল চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন।

এর আগে মাদ্রাজ আই আই টি-র ক্ষেত্রে সরকার মূল প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ নয় কিন্তু খুব কাছাকাছি থাকা কিছু শক্তির কাছে মাথা নুইয়েছিল। ফলস্বরূপ হিন্দু-বিরোধী কার্যকলাপেও বাধা দিতে ব্যর্থ হয়। তখন সরকার বুঝতে পারেনি তাদের এই প্রশ্রয়ে এই ধ্বংসাত্মক শক্তি অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানে কীভাবে দ্বিগুণ উৎসাহে মাথাচাড়া দেবে।

পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিকতম ঘটনা তারই একটি জ্বলন্ত সাক্ষী। প্রসঙ্গত সম্ভাব্য প্রধান হিসেবে পরিচালক ঝানু বড়ুয়া, সন্তোষ সিভান, রাজকুমার হিরানির নাম সৈয়দ আখতার মির্জার উত্তরসূরী হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তর থেকে কৌশলে বাজারে

মেগা ধারাবাহিক 'মহাভারত'-এ যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় গজেন্দ্র চৌহান।

ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু চূড়ান্তভাবে মনোনীত হলেন চৌহান। শুরু হয় ছাত্রদের প্রতিবাদ।

জানা দরকার, বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত আমির খান অভিনীত হিট ছবি 'পি কে'র পরিচালক রাজকুমার হিরানিকে ওই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসালে হিন্দু-বিরোধী কায়েমি স্বার্থ বুঝে যেত তাদের বিরুদ্ধে মাথা তোলার কেউ নেই। কেননা এই ছবিতে ছিল হিন্দু সংবেদনশীলতার প্রতি এক বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি। তাই যে মুহূর্তে চৌহানের নিয়োগের খবর পৌঁছয় শুরু হয়ে যায় বিক্ষোভ আন্দোলন। এখন প্রতিবাদের যুক্তিগুলিও খুব ধোঁয়াটে। দু'টি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়া প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদের দু'রকম ব্যাখ্যা দেখিয়েছেন।

(১) টাইমস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ছাত্ররা বলছে কোনো রাজনৈতিক নিযুক্তি নিয়ে তাদের অসন্তোষ নয়। তাদের কথায় যে চলচ্চিত্রীয় শিক্ষা দীক্ষা বা জ্ঞান নিয়ে মতো একটি গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের কর্তা হতে গেলে থাকা উচিত গজেন্দ্র চৌহানের ক্ষেত্রে নাকি তাতে খামতি রয়েছে।

(২) এনডি টিভি জানাচ্ছে, ছাত্রদের অভিমত গজেন্দ্র চৌহান তাঁর রাজনৈতিক পরিচিতির বলে বিজেপি-র লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কাউন্সিলের সভাপতি হচ্ছেন এটা মানা যায় না।

বাস্তবে জনপ্রিয় মহাভারতের টিভি সিরিয়ালে যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে অভিনয় করে বিখ্যাত হওয়া চৌহান প্রায় ৬০০ টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন। সঙ্গে তিনি ১৫০টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। তাঁর চলচ্চিত্রজীবন ৩৪ বছরের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। শুনলে অবাক হবেন ইউ আর অনন্তমূর্তি যিনি এই প্রতিষ্ঠানের দু' দুবারের জন্য চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি জীবনে কখনো কোনো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেননি। তাঁর অন্যতম যোগ্যতা ছিল ২০০৪ সালে আদর্শগতভাবে বিজেপি-কে পরাজিত করার অঙ্গীকার নিয়ে তিনি লোকসভা নির্বাচন লড়েছিলেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ক্রেডেনশিয়াল বা যোগ্যতা শব্দটি একটি ভাঁওতা। তবে এই সুবাদে তর্ক করা যেতেই পারে যে বর্তমানের সমস্ত ছাত্র ও চলতি শিক্ষক-কুলের সমষ্টিগত চলচ্চিত্রীয় যোগ্যতার নিরিখে চৌহান অনেক দূর এগিয়ে থাকবেন। মনে হয় কেবলমাত্র মানসিকভাবে বিকারগ্রস্তই চৌহানের যোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। যতদূর জানা যাচ্ছে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভের মূল কারণ তাঁর অপরাধ তিনি 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির' চরিত্রের সার্থক চলচ্চিত্রায়ন করেছিলেন।

প্রতিবাদীরা হয়ত ভুলে গেছেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের পথ চলাই শুরু হয়েছিল 'রাজা হরিশচন্দ্র' ছবিটি নিয়ে। এই হরিশচন্দ্র ছিলেন ভারতীয় তথা হিন্দু ইতিহাসের অন্যতম পূজ্য ব্যক্তিত্ব। এই ছায়াছবির জনক প্রবাদপ্রতিম দাদাসাহেব ফালকের নামেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ পুরস্কারটি উৎসর্গীকৃত।

এই প্রতিষ্ঠানের কৃতঘ্নতার নিদর্শন হিসেবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পরম শ্রদ্ধেয়

দাদাসাহেব ফালকে সম্পর্কে এঁদের ঘৃণার একটি উদাহরণই যথেষ্ট। ৭২ বছর বয়সী বাম মনোভাবাপন্ন কেরলের পরিচালক আদুর গোপালকৃষ্ণনের মতে তাঁর হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকলে ১৯১৩-এর হরিশচন্দ্রকে ধরে ২০১৩ সালে ভারতে চলচ্চিত্রের ১০০ বছর উদযাপন তিনি বাতিল করে দিতেন। বরং ১৯৫৫ সালে পথের পাঁচালী দিয়ে সূচনা ধরে ২০৫৫ সালে তিনি শতবর্ষ পালনের পক্ষপাতী। সত্যজিৎ রায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের মহীরুহ এবং আদুর গোপালকৃষ্ণন দক্ষ চলচ্চিত্রকার। কিন্তু তাঁর ধৃষ্টতা শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছেন। (htpp://india.blogs.nytimes.com/2013/08/26/being-adoor-gopalkrishnan/) গজেন্দ্রের ক্ষেত্রে তাঁর যুধিষ্ঠির চরিত্র করাটাই যে তাঁর মূল অযোগ্যতা তা বেশ বোঝা যায় যখন প্রসিদ্ধ অভিনেতা বিনোদ খান্না বিজেপি সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও এফটিটি-এর চেয়ারম্যান হয়েছিলেন এবং তাঁর এই নিযুক্তিতে সেরকম আপত্তি ওঠেনি। বাস্তবে অনন্তমূর্তির পর তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সময়ের FTII গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান।

অন্যদিক দিয়ে এই কাজ যে হিন্দু-বিরোধী শক্তির তার নিশ্চিত ব্যাখ্যা হিসেবে বিগত চেয়ারম্যানদের চরিত্র লক্ষণগুলি একটু দেখা যাক :

(১) মৃণাল সেন--- অবিমিশ্র মার্কসবাদী।

(২) গিরিশ কারনাড— কুখ্যাত হিন্দু বিরোধী।

এই প্রসঙ্গে একটি অতীত ঘটনা বিশদে বলা দরকার। ২০১২ সালে মুম্বইয়ে আয়োজিত সম্মানীয় টাটা সাহিত্য উৎসবে আমন্ত্রিত কারনাডকে 'তাঁর জীবন ও থিয়েটার' এই বিষয়ের ওপর নির্দিষ্ট বক্তব্য রাখার অনুরোধে তিনি সম্পূর্ণ বিষয়চ্যুত হয়ে নোবেল লরিয়েট সাহিত্যিক V.S. Naipaul এর ওপর বিষোদ্গার করতে থাকেন। কেননা নইপাল ভারতের প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করার জন্য তাঁর গ্রন্থে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন সত্যিকারের বাকস্বাধীনতা আমাদের নেই।

(৩) মহেশ ভাট--- মূলত যৌন বিকারগ্রস্ত ছবির প্রযোজক যাঁর পুত্র ২০০৮-এর মুম্বই বিস্ফোরণে অভিযুক্ত ডেভিড হেডলির ঘনিষ্ঠ দোসর।

(৪) শ্যাম বেনেগাল তাঁর চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য যতটাই বিখ্যাত ততটাই পরিচিত বিজেপি বিরোধী অবস্থানের জন্য। যেমন তার বক্তব্য, ''সর্দার প্যাটেল নেহরুর মতো সমাজতান্ত্রিক মতের সমর্থক না হলেও তাঁর সঙ্গে অর্থনীতি ক্ষেত্রের এই পার্থক্যকে কখনই দক্ষিণপন্থী শক্তির সমর্থক বলে ব্যবহার করা উচিত নয়।''

এখন দেখুন যে চেয়ারম্যান সৈয়দ মির্জার স্থানে গজেন্দ্র চৌহান বসতে চলেছেন সেই মির্জা সাহেবের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কীরকম? প্যারিসের ব্যঙ্গ পত্রিকা Charlie Hebdo-র দপ্তরে হানা দিয়ে নির্বাচারে মুসলমান সাংবাদিকদের হত্যার পর সারা বিশ্ব যখন ধিক্কারে সোচ্চার এবং শিল্পীর চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো তাঁর মতো ব্যক্তির কাছে প্রত্যাশিত তখন এই সেকুলারবাদী বিশ্লেষণ করলেন :

''এই হত্যার প্রেক্ষিতে আমার মনে একটি প্রশ্ন আসছে। নিহত সাংবাদিকরা তাঁদের মতে যে নিখাদ সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন তার প্রতিক্রিয়ায় একটি জাতিগত বিদ্বেষে আক্রান্ত দেশে কী উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাবে না? সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার বাতাবরণে এমনিই যখন পরিস্থিতি সংবেদনশীল ও উত্তেজক, তখন এমন কাজ করা হঠকারিতার পরিচয়। মুসলমান সংখ্যালঘুদের ন্যায্য ব্যথা, বেদনা, হতাশা, অবমাননার কোনো মূল্যই দেওয়া হয়নি। এই অনুভূতিগুলি সবই ছিল সত্য যা সাংবাদিকরা বিবেচনা করেননি।''

এই ব্যক্তি (মির্জা) ANHAD নামে একটি এনজিও-র ট্রাস্টিও বটে। যার সম্বন্ধে Wikipedia বলছে, ''জ্ঞাত তথ্য অনুসারে এই সংস্থাটি স্বাধীন নয়। প্রকারান্তরে কংগ্রেস দলের একটি শাখা সংগঠন। এই এনজিওটি একটি নির্দিষ্ট বৈষম্যমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। এর টাকাকড়ি বৃটেন থেকে 'Christian Aid' নামে সংস্থার সূত্রে দেশে আসে।''

ঠিক আই আই টি মাদ্রাজে ছাত্রদের জন্য যেমন ঘোর হিন্দু-বিরোধী অরুন্ধতী রায় বাইরের গাইড হিসেবে রয়েছেন সেই একই ফর্মূলায় পুনের এফ টি আই আই-তে রয়েছেন হিন্দু-বিদ্বেষী আনন্দ পট্টবর্ধন ও যোগেন্দ্র যাদব।

পরিতাপের কথা, না ছাত্র না সরকার কেউই বুঝতে চাইছেন না যে এই সম্মানীয় সংস্থাগুলি চলে দেশের করদাতাদের পয়সায়। আর দেশের নাগরিকরা এই সরকারকে বিপুল ও অভূতপূর্ব সংখ্যাধিক্যে জিতিয়ে পক্ষান্তরে তাঁদের মত জানিয়ে বলেছেন সরকার নিজের মতো করে দেশ চালাক যার মধ্যে এই সমস্ত সংস্থার সুস্থ পরিচালনা করাও এক্তিয়ারে পড়ে।

মোদী সরকার এফ টি আই আই এবং তার ছাত্রদের জন্য ইতিমধ্যেই অনেক কাজ করেছে। সাম্প্রতিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দু' বছর আগে অবধি এক অদ্ভুত নিয়মে এফ টি আই আই-এর শিক্ষকরা একটি নির্দিষ্ট মাসে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক শাখা থেকে তাদের বেতন বাবদ ব্যক্তিগত ঋণ নিতে অভ্যস্ত ছিল। কেননা এটাই ছিল চালু পদ্ধতি।

সংস্থাটি পরবর্তীকালে ওই ঋণ সুদ সমেত ব্যাঙ্কে ফেরত দিত। বর্তমান সরকার সংস্থার জন্য ৮০ কোটি টাকা গত বছরে খরচের অনুমোদন দিয়েছে। ইতিমধ্যে নতুন কিছু স্টুডিও তৈরি হয়েছে। চলতি বছরে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে সংস্থাকে অতি উৎকর্ষের সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা হয়েছে।

এতসব কর্মকাণ্ডের কোনো প্রভাব সংস্থার তথাকথিত শুভচিন্তকদের ওপর পড়েনি। এতে ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখা দিচ্ছে, তাঁদের যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এতে তাঁদের কোনো হেলদোল নেই। তাঁরা মগ্ন অন্ধ হিন্দু-বিরোধী প্রচার নিয়ে। পাগলের গো বধে আনন্দ!

লেখক www.swastik.net.in-এর প্রতিষ্ঠাতা।

মোদী-র 'মেক ইন ইন্ডিয়া'

কোপেনহেগেন ভুলে প্যারিসে জলবায়ু সম্মেলনে এগোতে চাইছে বিশ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'আর কোপেনহেগেন চাই না'। আগামী ডিসেম্বরে প্যারিসে যে জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন হতে চলেছে তার প্রার্থনা এখন এটাই। ২০১২ সালে কোপেনহেগেনে যে জলবায়ু সম্মেলন হয়েছিল তা তো নিষ্ফলা ছিলই, উপরন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ণ রোধে দায়িত্ব কার সে প্রশ্নও তুলে দিয়েছিল। কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা কার্বন মনোক্সাইডের মতো দূষিত গ্যাসীয় পদার্থ উৎপাদন যথাসম্ভব কম করার দায়িত্ব যে উন্নত দেশগুলির ওপরই বর্তায় এবং এর বোঝা বেশি চাপালে শিল্পোন্নয়ন থমকে যেতে বাধ্য—এই সরল সত্যটাই কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলনে বোঝানো যায়নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকল্পনায় আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে (ইউনাইটেড নেশনসন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) প্রায় হাজার চল্লিশ প্রতিনিধি যোগ দিতে চলেছেন বলে খবর। সেটা হলে সংখ্যার নিরিখে বিশ্বরেকর্ড হবে। প্রথমবারের জন্য নাগরিক সমাজ, বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও অন্যান্য অরাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ২০,০০০ ছুঁতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্রগুলি সামগ্রিকভাবে এই চুক্তির দিকে এগোবে যাতে বিশ্ব উষ্ণায়ণ ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখা যায়। ২০১৫-র প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনের বিশেষ প্রতিনিধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের রাষ্ট্রদূত লরেন্স টুবিয়ানার কথায়—'আমরা একটা চুক্তির বিনিময়ে আরেকটা চুক্তি চাই না। এটা বলতেই হচ্ছে যে আমরা সবার স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে সে ব্যাপারে যেমন সজাগ থাকব, তেমনি এটাও ঠিক যে প্রয়োজনে সবাইকেই তাদের কিছু না কিছু স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতার পথে যেতে হবে। আমরা শান্তিপূর্ণ সম্মেলন চাইছি, ঝঞ্ঝাটপূর্ণ সম্মেলন নয়।' একইসঙ্গে এই সম্মেলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে লড়াইয়ে ২০২০ সালের মধ্যে উন্নত দেশগুলির অনুদানে যে ১০০ বিলিয়ন ডলারের সবুজ জলবায়ু তহবিল তৈরি হয়েছে উন্নতশীল দেশগুলির মাঝে তা বণ্টনের সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসন্ধান করা।

টুবিয়ানার বক্তব্য : 'আমাদের ভাবনাটা এক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী যে নিম্ন কার্বন অর্থনীতিকে স্বাগত জানাতে কোন ধরনের অর্থনৈতিক কৌশলের প্রয়োজন। অধিকাংশ দেশে এই নিম্ন কার্বন অর্থনীতির (Low carbon economy) চেয়ে উচ্চ কার্বন অর্থনীতিতে (High carbon economy) খরচ বেশি

হয়।' এব্যাপারে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি তুলে ধরে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর মতে, মোদী দেখিয়ে দিয়েছেন সবুজ ভারতের জন্য কীভাবে বিনিয়োগ আনা যায় উন্নয়নের কারিগরি কৌশলকে সঙ্গে রেখেই। এই ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বিশ্ব উষ্ণায়ণ রোধে সদস্য দেশগুলিকে আই এন ডি সি (ইনটেনডেড ন্যাশনালি ডিটারমাইনড কনট্রিবিউশন) জমা দিতে হবে যাতে তারা এই প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে পারবে কি না বা বজায় রাখতে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তা উল্লেখ থাকবে। ১৯৬টি দেশের মধ্যে ৪০টি দেশ ইতিমধ্যেই আই এন ডি সি জমা দিয়ে দিয়েছে। বিশ্বের কার্বন নির্গমনের প্রায় ৩৫ শতাংশই এই দেশগুলি থেকে হয়। ভারত আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে তার আই এন ডি সি জমা দেবে বলেছে।▮

আধুনিক গ্রাম গড়ে তুলতে ‘গ্রাম সঙ্গম’ এক অতুলনীয় প্রচেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১২ থেকে ১৪ জুন বেঙ্গালুরুর প্রশান্তি কুটীরম্-এ গ্রাম সঙ্গম অনুষ্ঠান হয়ে গেল। গ্রাম সঙ্গম অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কর্ণাটক দক্ষিণ প্রান্তের গ্রাম বিকাশ বিভাগ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আর এস এসের অখিল ভারতীয় ব্যবস্থাপ্রমুখ মঙ্গেস ভেণ্ডে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় গ্রামবিকাশ প্রমুখ ড. দীনেশ, ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ভি. নাগরাজ, প্রান্ত সঙ্ঘচালক এম. বেঙ্কটরাম, প্রান্ত কার্যবাহ এন. টিপেস্বামী-সহ আরও অনেকে।

গ্রাম সঙ্গমে বক্তব্য রাখছেন অখিল ভারতীয় গ্রাম বিকাশ সংযোজক ড. দীনেশ।

মূলত গ্রাম সঙ্গম করার অর্থ একটি গ্রামকে স্বনির্ভর হিসাবে গড়ে তোলা। যেখানে শহরগুলিতে নানান সুযোগ-সুবিধা থাকলেও গ্রামগুলি অনেকাংশে পিছিয়ে আছে। তাই ‘মডেল ভিলেজ’ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রশান্তি কুটীরম্-এ গ্রাম সঙ্গমে উদ্যোগ নিয়েছে গ্রামবিকাশ বিভাগ। দেশের মধ্যে প্রথম ‘মডেল ভিলেজ’ হিসাবে গড়ে ওঠে মহারাষ্ট্রের আন্না হাজারের গ্রাম রালেগাঁও সিদ্দি। সেই গ্রাম গড়ে তুলতেও আন্না হাজারে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সাহায্য নিয়েছিলেন। তবে গ্রামের উন্নতি বলতে শুধু অর্থনৈতিকই নয়, সামাজিক শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার, সামাজিক সুরক্ষা-সহ বেশকিছু উন্নয়মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাম সঙ্গম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসে অখিল ভারতীয় ব্যবস্থা প্রমুখ মঙ্গেস ভেণ্ডে বলেন, ‘‘প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে একটি উন্নতমানের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু ছিল। গ্রামগুলিতে বিচার বিভাগও ছিল। এই সমস্ত বিচার বিভাগের দায়িত্বে মহিলারাও বিচারকের আসনে বসতেন। যাদের থেকে একটি নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া যেত। অর্থাৎ গ্রাম্য এই বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে যেমন বিশ্বাস গড়ে উঠত তেমনি একাত্ম হওয়ার মধ্যে দিয়ে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হোত।’’ এ প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, ‘‘আজকের দিনে অর্থনৈতিক সুবিধা সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছয়নি। প্রাচীনকালে তা হোত। কথিত আছে, রাজা মহাপদ্মানন্দ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য তিনি তা বিলিয়ে দিয়েও গেছেন।’’ সমাজসেবী এবং বিবেকানন্দ যুব আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ড. বালসুব্রহ্মনিয়াম জানান, ‘‘স্বাধীনতার পর থেকে যে সরকারই ক্ষমতায় এসেছে তারা গ্রামের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহু টাকা বরাদ্দ করলেও গ্রামোন্নয়নের কাজ সেভাবে হয়নি। গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত নীতির ফলে মাঝপথেই আটকে গেছে উন্নয়নের রথের চাকা। তবে ‘মডেল ভিলেজ’ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত তা হলো কৃষিকাজ পদ্ধতি। বর্তমানে গ্রামের এই কৃষিকাজ পদ্ধতিতে জৈব সারের তুলনায় ব্যবহার করা হচ্ছে রাসায়নিক সার। যার ফলে অকালেই বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে চাষের জমিগুলি। তাই বন্ধ করা উচিত রাসায়নিক সার।’’ এরকমই মত গ্রামের এক প্রবীণ কৃষকের। তাঁর মতে, ‘রাসায়নিক সারের মধ্যে দিয়ে বিষ ছড়ানো হচ্ছে। তাই রাসায়নিক সারের ব্যবহার বন্ধ হওয়া দরকার।’ গ্রাম সঙ্গম অনুষ্ঠানে নানা বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি ১৮টি বিষয়ে ‘ভিডিও শো’র মাধ্যমে জৈব সারের ব্যবহার, জল সংরক্ষণ, শস্য ঝাড়াই, গ্রামকে পরিবেশ বান্ধব গড়ে তোলা, মহিলাদের স্ব-নির্ভরতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। গ্রাম সঙ্গমে যে বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়লো তা হলো— বর্তমানে গ্রাম বিকাশ বিভাগে মোট ১৮১৯ জন কাজ করছেন। তার মধ্যে দক্ষিণ কর্ণাটকের ১৫টি জেলায় ১ হাজার ২৮৫ জন পুরুষ এবং ৫৩৪ জন মহিলা। মধ্যে চামরাজানগরের কোল্লেলালা মহকুমার অংশগ্রহণকারী সদস্যের সংখ্যা ১৭৬ জন। আবার সমস্ত জেলার মধ্যে পুত্তুর জেলার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সর্বাধিক— ২০৪ জন।

সমস্ত বিভাগের মধ্যে মহীশূরের অংশ-গ্রহণকারীর সংখ্যা ৬০০। মান্ড্য জেলার মহিলা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৯০। এছাড়াও ২৫১ জন প্রবন্ধক, ৪৯ জন অধিকারী এবং বহু অতিথি উপস্থিত ছিলেন সঙ্গম-এ। সেখানে ৭০ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর বয়স ৩৫ বছরের নিচে। খুব আনন্দের বিষয় এই কর্মসূচিতে মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। শেষে এটাই বলা যায়, গ্রামকে উন্নত করতে গ্রাম সঙ্গমের ভূমিকা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার হিড়িক থাকলেও অনেকেই এখনও মনে প্রাণে চায় তার গ্রামকে ‘স্মার্ট ভিলেজ’ গড়ে তুলতে। উল্লেখ্য, গুজরাটের পুনসারি গ্রাম ভারতে একমাত্র ‘স্মার্ট ভিলেজ’ রূপে সারা দেশে পরিচিতি লাভ করেছে। ■

ম্যাগি না মহামারী ?

সুতপা বসাক ভড়

"বিদেশের কুকুর ধরি, স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া"— এই হয়েছে আমাদের অবস্থা। খাওয়া, পরা সবেতেই অন্যের অন্ধ অনুকরণ করে চলেছি। যতক্ষণ না ধাক্কা খাব, ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা হবে না। ধাক্কা খেয়েও কতজনের শিক্ষা হবে তাও বলা যায় না। এখন এক নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে ম্যাগি নিয়ে। দিল্লী থেকে শুরু করে বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ম্যাগির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ম্যাগিতে প্রচুর পরিমাণে সীসা উপস্থিত। সীসা মস্তিষ্ক এবং হৃৎপিণ্ডের জন্য ভীষণ ক্ষতিকারক। শিশুদের পক্ষে এটি আরও সাংঘাতিক। US Centers for Disease Control এবং The European Food Safety Agency-র মতে রক্তে সামান্যতম সীসাও বাঞ্ছনীয় নয়। সামান্য পরিমাণ সীসা শরীরে প্রবেশ করলে তৎক্ষণাৎ কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যদি সীসা শরীরের রক্তে, মাংসে এবং অস্থিতে জমা হতে থাকে, তাহলে পরিণাম মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাছাড়া ম্যাগিতে এম এস জি মোনো সোডিয়াম গ্লুটামেট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। যার ফলে হাইপারটেনসান, উচ্চ রক্তচাপ-এর সম্ভাবনা বহুগুণে বেড়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের যুব সমাজ যদি ম্যাগি খেতে থাকে তাহলে কয়েকবছরের মধ্যে আমাদের দেশের নাগরিকদের শারীরিক অবস্থার কথা ভাবুন— একদিকে সীসা থেকে নানান জটিলতা, অপরদিকে উচ্চ-রক্তচাপের মতো গম্ভীর অসুখ। এইরকম অসুস্থ যুবসমাজ গঠনের পেছনে বিদেশি রাষ্ট্রগুলির কোনো চক্রান্ত নেই তো?

১৮৭২ সালে সুইজারল্যান্ডে আদি ম্যাগি কোম্পানি স্থাপন করেছিলেন জুলিয়াস ম্যাগি। ১৯৪৭ সালে Magi International Brand Instant Soup & Noodles-এর মালিকানা আসে Nestle কোম্পানির হাতে। বর্তমানে ম্যাগি নুডলস্-এর সব থেকে বড় বাজার হলো ভারতবর্ষ। Nestle কোম্পানির এই সাফল্য কিন্তু একদিনে আসেনি। একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার রূপায়ণ হলো এই সাফল্য। ১৯৮২ সালে ভারতের বাজারে ম্যাগির প্রথম আত্মপ্রকাশ। বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের নিঃশুল্ক ম্যাগি বিতরণ করা হয়। শিশুদের মধ্যে কারো কারোর এই নতুনত্বের স্বাদ ভালো লেগেছিল। কোম্পানি জানত শিশুরা নতুন জিনিস তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে। তাদের ব্যবসার প্রথম পদক্ষেপে তারা সাফল্য পায়। এবার শুরু হলো বিজ্ঞাপন। প্রথম দিকে Nestle কোম্পানি চেষ্টা করেছিল প্রধান খাদ্য হিসাবে বাজার নেবার কিন্তু আমাদের দেশের খাদ্য সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না দেখে তারা পিছিয়ে এসে জলখাবার হিসাবে ম্যাগিকে তুলে ধরার চেষ্টা করে।' ট্যাগলাইন হয় স্মার্ট মা'র স্মার্ট শিশু ম্যাগি খায়। সঙ্গে বিজ্ঞাপনে দেখানো হলো তাড়াতাড়ি রান্না হয়, খেতে ভাল এবং সস্তা। আবার কারচুপি! এবং আদৌ সস্তা নয়। আমাদের ভাত, রুটি, মুড়ির সঙ্গে কোনো তুলনাত্মক বিচারে পাল্লা দিতে পারবে না ম্যাগি। যাইহোক, বাস্তবে ব্যাপক বিজ্ঞাপনের ধুয়ো তুলে, নানারকম মুখরোচক স্বাদে, মিথ্যে পুষ্টির আশ্বাসন দিয়ে ম্যাগি অনায়াসে আমাদের রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। বাচ্চাদের জলখাবারে ম্যাগি খুবই প্রিয় খাদ্য হিসাবে প্রতিপন্ন হলো। মা-ও নিশ্চিন্ত, কারণ বিজ্ঞাপনে অমিতাভ বচ্চনের মতো ব্যক্তিত্ব বলছেন, ম্যাগিতে সব আছে— 'টেস্ট ভী, হেলথ্ ভী।' এইভাবে বিজ্ঞাপনের গোরু গাছে উঠে গেল।

২০১৫ সাল (এই বছর) জুন মাসে উত্তরপ্রদেশের Food Safety Regulators দেখল যে Maggi 2 minute Noodle-এ অনুমোদিত মাত্রার ১৭ গুণ বেশি সীসা ও প্রচুর মাত্রায় mono sodium glutamate আছে। একই কারণে ৩ জুন, নিউ দিল্লী

সরকার ম্যাগি বিক্রি ১৫ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়। ৩৯টির মধ্যে ২৭টি নমুনা প্রয়োগশালার পরীক্ষায় ফেল করার জন্য গুজরাটে ৪ জুন এফডিএ ম্যাগি বিক্রি ৩০ দিনের জন্য বন্ধ করে। ওইদিনই অসম সরকার ম্যাগির Extra delicious Chicken Noodle-এর বিক্রি, বিতরণ এবং জমা (Storage) সবের ওপর ৩০ দিনের নিষেধাজ্ঞা জারি করল। এছাড়া Big Bazar, Easyday, Nilgiris-ও ম্যাগি ব্যান করল। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারও একই পদক্ষেপ নেয়। ৫ জুন Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI) ম্যাগি নুডলস্ মানুষের খাদ্য হিসাবে 'unsafe & hazardous' ঘোষণা করে এবং ৬ জুন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্য ম্যাগি বিক্রির ওপর প্রতিবন্ধ লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এখন আমরা যদি একটু চিন্তা করি ম্যাগি আমাদের দেশে এসেছিল জলখাবারের বিকল্প হিসাবে; কিন্তু এখন আমরা অনেকেই ম্যাগির বিকল্প হিসাবে অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। আরও একটি সত্য আমরা অস্বীকার করতে পারি না— আমাদের দেশে আজ যে খাবার এত জনপ্রিয় হয়েছে তার শুরু করেছিল ম্যাগি। আমরা, ভারতীয়রা নুডলস্-এর ব্যাপারে জেনেছি Nestle কোম্পানির ম্যাগি থেকে, চাইনিজ রেস্তোঁরা থেকে নয়। Nestle-এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে Mc Donald, KFC, Rofius & Bustin এর মতো বিদেশি কোম্পানিগুলি গুটি গুটি করে আমাদের খাদ্যসংস্কৃতির ওপর আক্রমণ করে দিয়েছে। আর আমাদের যুবসমাজ হ্যাংলার মতো স্বদেশের সুস্বাদু, পুষ্টিকর খাদ্য ফেলে বিদেশের নিম্নতর খাদ্যসামগ্রীর দিকে ঝুঁকে নিজেদের স্মার্ট প্রতিপন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নিজস্ব অভিজ্ঞতা বলি, একবার আমার শিশুদের আগ্রহে Mc Donald-এর extra vaganza পিৎজা খেতে যাই। একে তো বসার জন্য আরামদায়ক চেয়ারটুকু তারা দেয় না, তার ওপর প্রায় ৫০০ টাকা দিয়ে ৬ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের একটা পাঁউরুটির ওপর গোটাকতক সবজীর টুকরো, আরও কিসব ছড়িয়ে দিল— যা মোটেও সুখাদ্য নয়। তারপরে কতগুলো হজমের ওষুধ খেয়ে প্রায় একঘণ্টা সপরিবার রাস্তায় বনবন করে হেঁটেছি আর জীবনেও ওমুখো হইনি। এই তো অবস্থা!

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আমরা ওই বিদেশি কোম্পানিগুলোর খাবার যথেচ্ছভাবে কিনে তাদের আর্থিক লাভান্বিত করব? আমাদের দেশের খাদ্যসংস্কৃতি খুবই বৈচিত্র্যময় এবং উচ্চকোটির। জলখাবারের জন্য রুটি, লুচি, পরোটা, মুড়ি, চিড়ে, তেলেভাজা খুবই সুস্বাদু। আমরা রুটিতে আখের গুড়, খেজুর খেতে কত ভালবাসি! শিশুদের জলখাবারে আম, কলা, দুধ, রুটি দিয়ে 'ফলার' দিয়ে দেখুন তো? সব ফেলে ওইসব স্বাস্থ্যবর্ধক, সুস্বাদু খাবার মুখে তুলে নেবে। আসলে, প্রথমে আমরাই আমাদের শিশুদের ওইসব বিদেশি খাবার খাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাই। তারপর যখন সামলাতে পারি না তখন দুঃখ করি। এটা আমাদেরই ভুল। আমরা শক্ত হলে ওই Nestle কোম্পানির সাধ্য ছিল না আমাদের শিশুদের ম্যাগিতে আসক্ত করে। তবে এখনও সময় আছে— শিশুদের সহজলভ্য নুডলস্, সস, স্যুপ, ঠাণ্ডা পানীয় আর অন্যান্য বিদেশি খাদ্যদ্রব্যের জবাব দিন আমাদের ঘরে তৈরি ভাত, রুটি, আচার, ডাল, তরকারি, লেবু বা কাঁচা আমের সরবৎ দিয়ে। এত দুর্বল আমরা নই যে, বারবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, Nestle-এর মতো বিদেশি কোম্পানির ফাঁদে পা দেব। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মানিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

সেতুবন্ধন

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একটি সেতুর দাবি প্রায় চার দশকের পুরনো। কিন্তু গ্রামবাসীদের সেই দাবি পূরণে কোনো মন্ত্রী বা আমলাকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। বাড়িয়ে দেয়নি কেউ সাহায্যের হাতও। অতঃপর নিজেরাই এগিয়ে এলেন নিজেদের কষ্ট লাঘব করতে। সীরসা থেকে আলিকা ও পানিহারীর মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলতে নিজেদের উদ্যোগেই একটি সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন তারা। কোটি টাকার সেতু নির্মাণে এতদিনেও যখন কোনো সরকারি উচ্চবাচ্য দেখা যায়নি তখন গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টাতেই তা তৈরি করা হবে বলে ঠিক হয়।

হরিয়ানার সীরসা জেলার ১১টি গ্রামে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার মানুষের বাস। যাদের জীবিকা নির্বাহ হয় ফার্ম হাউসে কাজের মাধ্যমে। এখানকার গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি সীরসা থেকে আলিকা ও পানিহারি গ্রামদু'টির মধ্যে ৩০ কিলোমিটারের যে দূরত্ব তা সহজেই কমিয়ে ফেলা সম্ভব একটি সেতু নির্মাণের মাধ্যমে। ঘাগ্গর নদীর উপর সেতু নির্মাণ হলে যাতায়াতের দূরত্ব যেমন অনেকটাই কমে যাবে তেমনি গ্রামের ফার্ম হাউসগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যও খুব সহজেই পাঞ্জাবের বাজারে পাঠানো যাবে। বহুদিনের দাবি হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো তৎপরতা নেওয়া হয়নি। ভোটের আগে সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোট পেরোতেই নেতা-নেত্রীরাও তা ভুলে যান। অবশেষে ধৈর্য্যের বাঁধ অতিক্রম করায় এলাকাবাসী নিজেরাই ময়দানে নেমে পড়েন। ২৫০ ফুট লম্বা এবং ১৪ ফুট চওড়া সেতু নির্মাণ করতে তারা ১ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে। এছাড়াও সেতু তৈরির কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য ২৫ জনের একটি কমিটিও গঠন করা হয়। এরকম এক সাহসী পদক্ষেপ আগে কখনও কোথাও নেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই। কারণ একাজ যেমন ব্যয়বহুল তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ। এসব সত্ত্বেও পিছিয়ে যায়নি সিরশা-পানিহারির গ্রামবাসীরা। কিন্তু ১ কোটি টাকার তহবিল গঠন হলো কীভাবে? এ প্রসঙ্গে পানিহারি গ্রামের বাসিন্দা হরদেব সিং বলেন, দিনমজুর বা খেটে খাওয়া মানুষরা যেমন ৫০০ কাঠা জমি দিয়েছে তেমনি পেনশনভুক্ত বিধবা মহিলারাও এই কাজের জন্য ১ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছে। এই ভাবেই মানুষের সাহায্য নিয়ে আমরা একটা তহবিল দাঁড় করাতে পেরেছি। এর পাশাপাশি সীরসার সাংসদ চরণজিৎ সিং রোড়ি এবং প্রাক্তন মন্ত্রী গোপাল কাণ্ডা ১ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। বাকি আর কোনো নেতা-মন্ত্রীর কাছ থেকে এই সুবিধা পাওয়া যায়নি। পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়র হরদেব সিং আরও জানান, এই সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা আমাদের সবাইয়ের। তাই সেতু উদ্বোধনের জন্য আমরা কোনো মন্ত্রী-আমলার হাতে না করে এলাকার সন্ত মহন্ত ব্রহ্মদাসকে দিয়ে করাবো।

সেতু নির্মাণের ফলে এলাকাবাসীর এতদিনের দাবি যেমন পূর্ণ হলো তেমনি সরকারকেও এক জবাব দিতে সক্ষম হলেন তাঁরা। সেতু নির্মাণের ফলে পানিহারি-আলিকা গ্রামের মধ্যে যেমন নয়া যোগসূত্র গড়ে উঠলো তেমনি আশপাশের বাকি নয়টা গ্রাম বুঝকরমগড়, ফারওয়াইখুর্দ, ধানি কাহান সিং, সিকান্দারপুর, রসুলপুর, বেড়ি এবং ভিসা গ্রামও তাদের হাতে হাত মেলালো। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

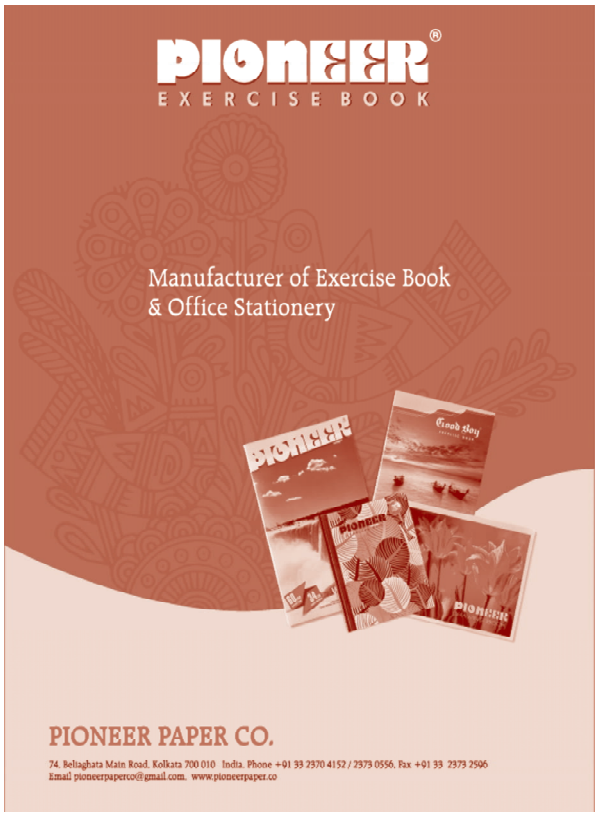

‘যথার্থ সাধুত্বের মতোই যথার্থ নারীত্ব ভারতবর্ষে কেবল বাহ্য ব্যাপার ছিল না। প্রকৃত নারীত্বের এই উচ্চ ভাবটি শিক্ষার মাধ্যমে তুলে ধরা এবং উন্নত করার প্রচেষ্টা না থাকলে তা কখনও নারীগণের প্রকৃত শিক্ষারূপে পরিগণিত হতে পারে না।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পশ্চিমবাংলার হিন্দুদের আত্মসমীক্ষার দলিল

পুস্তক প্রসঙ্গ

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

গ্রন্থটির নামেই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু পরিষ্কার। মোট আটটি নিবন্ধ নিয়ে ১১১ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ। নিবন্ধগুলির শিরোনাম এইরূপ— (১) অনুপ্রবেশ ও পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনবিন্যাস, (২) অনুপ্রবেশ সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন একটি জন আন্দোলন, (৩) হিন্দু উদ্বাস্তুরা এখনও আসছেন— বাংলাদেশ, উদ্বাস্তু ও নাগরিকত্ব, (৪) পশ্চিমবঙ্গের ইসলামি ভবিষ্যৎকে আরো নিশ্চিত করেছে শাহবাগ আন্দোলন, (৫) পশ্চিমবঙ্গের শেষ দিনগুলি— ধর্মে জন্ম, ধর্মেই আসন্ন বিকাশ, (৬) সুবে বাংলা হাসিলের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে, (৭) পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়কে কি সংখ্যালঘু বলা যায়? (৮) পুরো পশ্চিমবঙ্গই এখন খাগড়াগড়। লেখক শ্রী মোহিত রায় প্রতিটি প্রবন্ধই যত্ন নিয়ে লিখেছেন এবং তথ্য সহকারে। বইটি নিঃসন্দেহে পশ্চিমবাংলার হিন্দুদের আত্মসমীক্ষার একটি দলিল।

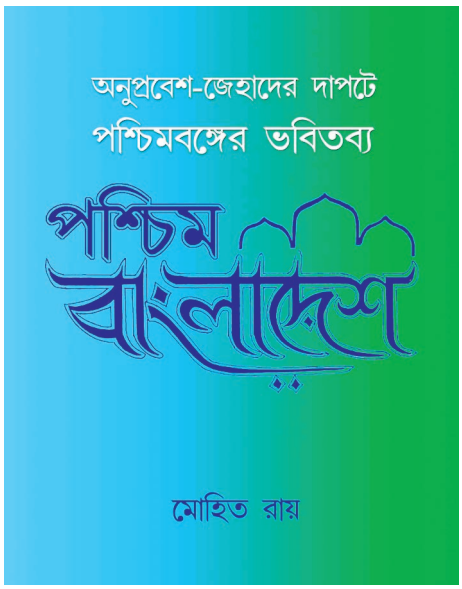

বর্তমানে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অনুপ্রবেশ। লেখক জানিয়েছেন ১৪ জুলাই ২০০৪ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রকাশ জয়সোয়ালের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বেআইনি বাংলাদেশি রয়েছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৫৭ লক্ষ বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। লেখকের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয় ভারতের প্রায় সব রাজ্যগুলিতে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। লেখক তথ্যসহকারে দেখিয়েছেন, যে যে জায়গায় অনুপ্রবেশকারীরা ব্যাপক সংখ্যায় বাস করছে সেখানে তারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করছে। শরীয়তি ব্যবস্থা চালু করেছে। লেখকের দুঃখ কোনো রাজনৈতিক দল এই নিয়ে চিন্তিত নয়। চিন্তিত নয় সংবাদমাধ্যমগুলি।

লেখক শ্রীরায় একটি বিষয়ের উপর বিশেষ ভাবে আলোকপাত করেছেন তা হলো হিন্দুদের দলে দলে পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ ত্যাগ। তাঁর হিসাবে ১৯৭১ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে ৬৩ লক্ষ হিন্দু বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন এবং যাঁরা দেশত্যাগ করেছেন তাঁদের সম্পত্তি চিহ্নিত হয়েছে শত্রুর সম্পত্তি হিসাবে। কিন্তু মজার কথা, এবং যা কঠোর সত্য— গত ত্রিশ বছরে যত হিন্দু ভারতে এসেছেন তার তিনগুণ এসেছেন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান।

লেখক যে বিষয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তা হলো পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কুক্ষিগত করে রেখে তাঁদের সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছেন, যার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গকে একটি মুসলমান রাজ্য তৈরি করা। এই কুপ্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার জন্য শ্রী রায় কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন— যেমন, বাংলাদেশি মুসলমানদের বিতাড়ন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাদ্রাসা তুলে দেওয়া, ইমাম ভাতা বন্ধ করা, পাড়ায় পাড়ায় অনুপ্রবেশ বিরোধী কমিটি গড়ে তোলা এবং সন্ত্রাস বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার দরকার যা না বললে নয়।

লেখক শ্রী রায় এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে মুসলিম মৌলবাদীদের বাড়বাড়ন্ত, পশ্চিমবঙ্গকে আরেকটি মুসলমান প্রধান রাজ্য তৈরি করা এবং এ বিষয়ে তৃণমূলী, কংগ্রেসী তথা বামপন্থীদের নীরবতা বা পরোক্ষ সমর্থন বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তিনি এতটুকু আত্মসমালোচনা করেননি। তৃণমূলী, কংগ্রেসী তথা বামপন্থীদের মতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি নীরব তথা উদাসীন কেন? অন্য দলগুলির উপর দোষারোপ করে নিজেদের দোষ ঢাকা যায়? হিন্দুত্ববাদী দলগুলি মুসলমান মৌলবাদী তথা কংগ্রেস প্রভৃতি দলগুলির হিন্দু বিরোধী এবং দেশবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে কি? সেই ১৯৯০ সালে বাবরি ধাঁচা ভাঙ্গার জন্য মুসলমানরা একটানা প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে, যতদিন এর প্রতিকার না হয় তত দিন মুসলমান মহিলাদের বোরখা বা শাড়ির উপর ওড়না পরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর তারা মিছিল করে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি কি ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সালে কলকাতা দাঙ্গা বা

এরকম কোনো ভয়াবহ দাঙ্গার স্মৃতি জাগিয়ে রাখার জন্য কোনো মিছিল করেছে? কাশ্মীরে এ পর্যন্ত ১০ লক্ষ হিন্দুকে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং তাঁদের সম্পত্তি শত্রুর সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি কোনো একটি বিশেষ দিন কাশ্মীর দিবস উদযাপন করে কড়া কড়া ভাষায় কাশ্মীর সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বাড়ি ফিরে যায়, তারপর ৩৬৪ দিন রিপ ভ্যান উইংকিলের মতো নিদ্রা যায়। এর জন্য তো আন্দোলন দরকার, বিশেষ একটি দিন নয় প্রতিদিন। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি কি তা করছে?

বিজেপি-সহ হিন্দুত্ববাদী দলগুলি হিন্দু-মুসলমান প্রেমে বিভোর। সেদিন একটি আলোচনা সভায় তিনজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আবেগের সঙ্গে বলতে শুনেছিলাম আমরা হিন্দু মুসলমানেরা চিরকাল একসঙ্গে ছিলাম, চিরকাল একসঙ্গে থাকব। এই বিদ্বজ্জনেরা যদি একটু কোরান ও হাদিস পড়তেন তাহলে এমন কথা বলতে পারতেন না, কেননা এই সব গ্রন্থগুলিতে মুসলমানদের অমুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলা হয়েছে এবং এও বলা হয়েছে, অমুসলমান দেশকে মুসলমানদের দেশ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ইদ আসলে কংগ্রেস, তৃণমূল প্রভৃতি দলগুলির মধ্যে ইদ উৎসব পালন এবং ইফতার ভোজনে অংশ নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। এদের দেখাদেখি বিজেপি নেতারাও ইদ উৎসব পালন করতে শুরু করেছেন। কোনো এক বিজেপি নেতাকে দেখেছি তাঁর নিজের ছবি-সহ রাজাবাজার, বেলগাছিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান এলাকায় বড় বড় করে ইদ মুবারক জানাতে। কিন্তু তিনি যদি কোরান পড়তেন তাহলে 'ইদ মুবারক' মুখে আনতেন না। কোরানে রোজা-সহ ইদ উৎসব পালনের উদ্দেশ্য হলো কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি। ইদ পালন করে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগষ্ট হিন্দু নিধন শুরু হয়েছিল। এরকম ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে ভুরি ভুরি আছে।

বিজেপি ও অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী দলগুলিতে মুসলানদের সদস্য করার হিড়িক পড়ে গেছে। কিন্তু এই দলগুলির নেতারা কি ভুলে গেছেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের দলে দলে নেওয়ার জন্য দেশকে কি মূল্য দিতে হয়েছিল? এই কংগ্রেসী মুসলমানদের চাপে কংগ্রেস কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের প্রতিবাদ করতে পারেনি, হিন্দু মহাসভা-সহ হিন্দুত্ববাদী দলগুলিকে অচ্ছুত করে রেখেছিল। কলকাতা, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে তারা হিন্দুনিধন সম্বন্ধে নীরব ছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করতে পারেনি। বিজেপিসহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি মুসলমানদের দলে নিলে এরকমই আত্মহননের পথ নেবে। একটা কথা, মুসলিম দলগুলি যদি হিন্দুদের সদস্য না করে তো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির কি দায় পড়েছে মুসলমানদের দলে নেওয়ার? সাম্প্রতিক লোকসভার ফল নির্দেশ করেছে যদি হিন্দুদের বিশ্বাস অর্জন করা যায় তাহলে মুসলমান তোষণের প্রয়োজন নেই। মুসলমানদের তোষণ করতে গেলে দল তথা সরকারের পতন হবে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভা থেকে এই শিক্ষা নিতে হবে। বাজপেয়ীজী হিন্দুদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেননি এবং সেই সঙ্গে মুসলমানদের খুশি করতে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর সরকারের পতন হয়।

শেষ কথা, শ্রী রায় তাঁর সুলিখিত গ্রন্থে মুসলমানদের বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ, পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসার প্রসার, মৌলবাদীদের কার্যকলাপ প্রভৃতি যা উল্লেখ করেছেন, সে বিষয়ে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি নীরব কেন? সেদিন নৈহাটি স্টেশনে দেখছিলাম সি পি আই (এম এল) দলের বড় বড় করে পোস্টার— কোনো এক জায়গার উল্লেখ করে, সেখানে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেছে কেন তার প্রতিবিধান চাই। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি অনুপ্রবেশ, মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বনাশা ফল, মৌলবাদীদের পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান রাজ্য করার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে পোস্টার কেন সারা দেশে ছড়িয়ে দেয় না? এতসব দূরে থাক, লোকসভা ইত্যাদি নির্বাচনের সময় (যেমন আমার দক্ষিণ দমদম এলাকায়) একটিও কেন পোস্টার পড়ে না? সত্যি কথা বলতে কী, মুসলমান, কংগ্রেস প্রভৃতি দলগুলির মতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলিকেও সমালোচনা করতে হবে। মোহিতবাবুর গ্রন্থটি পড়ে এই কথাই বারেবারে মনে আসছে।

অনুপ্রবেশ-জেহাদের দাপটে পশ্চিমবঙ্গের ভবিতব্য— পশ্চিম-বাংলাদেশ— মোহিত রায়। প্রকাশক : ক্যাম্প। মূল্য : ১২০ টাকা।

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street,
Kolkata - 700 016

M : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

‘সামাজিক সমরসতা নির্মাণে মাতৃশক্তির ভূমিকা’ নিয়ে আলোচনা সভা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১১ জুলাই মালদহ শহরের টাউনহলে ‘সামাজিক সমরসতা নির্মাণে মাতৃশক্তির ভূমিকা’ শীর্ষক এক আলোচনা সভা হয়। প্রধানবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর এস এসের-র কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য মধুভাই কুলকার্নি। তিনি সমবেত মাতৃমণ্ডলীর উদ্দেশে বলেন— ‘আগে কর্মের ভিত্তিতে জাতি নির্মাণ হোত, পরে সেটা জন্মের ভিত্তিতে হয়ে যায়। ফলে সমাজে দোষ উৎপন্ন হতে শুরু করে। তাই স্বামীজী দেশ পরিভ্রমণ করলে ছুঁয়াছুত দেখে আক্ষেপ করে বলেছিলেন দেশটা পাগলাগারদ হয়ে গেল। মহাপুরুষদের জন্য বাংলার পরিবেশ অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক ভাল। সঙ্ঘ হিন্দু সমাজকে নির্দোষ করার কাজ করে চলেছে। সমাজে সমরসতা নির্মাণে মায়েদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

মালদহের টাউনহলে মাতৃশক্তির সমাবেশে বিদ্রোহী সরকার, অদ্বৈতচরণ দত্ত ও মধুভাই কুলকার্নি।

মায়েরাই একাজ ভালোভাবে করতে পারেন।

দ্বিতীয় পর্বে মধুভাই মায়েদের সমরসতা নির্মাণে নিজের নিজের অভিজ্ঞতা বলার আহ্বান জানালে মায়েরা তাঁদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। গত ১২ জুলাই অনুরূপভাবে কলকাতার কেশব ভবনেও একটি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। দুই স্থানেই অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংস্কার ভারতীর শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়।

বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ সচেতনতা দিবস পালন

গত ১৫ জুন পশ্চিমবঙ্গ প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক নিগ্রহ সচেতনতা দিবস পালন করা হয়। এদিন সকালে সংগঠনের সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র দে’র নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরে না থাকায় উপস্থিত আধিকারিকের কাছেই স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে রাজ্যে ‘মেন্টেনেনস্ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অব পেরেন্টস্ অ্যান্ড সিনিয়র সিটিজেনস্ অ্যাক্ট-২০০৭’ চালু করার দাবি পেশ করা হয়। রাজ্যপালের কাছে বেসরকারি শিল্প শ্রমিক বিশেষ করে চটকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরা হয়। বিকালে জনজাগরণের উদ্দেশে শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনে সংগঠনের ব্যানার লাগিয়ে প্রচারপত্র বিলি করা হয়।

পুরুলিয়ায় বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের বৈঠক

গত ৩০ জুন পুরুলিয়া জেলার বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের জেলা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পুরুলিয়া নগরের সেবা ভারতীর কার্যালয়ে। বৈঠকে জেলা সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি--- পার্থ গাঙ্গুলি, সহ-সভাপতি— রাজেশ নন্দী। সম্পাদক— সৌম্যশঙ্কর ওঝা, সহ- সম্পাদক— সঞ্জয় গাঙ্গুলি ও শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সদস্য— কার্তিক মণ্ডল, হারাধন দুবে ও সঞ্জীব মাহাতো।

বৈঠকে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘেরও সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি— বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি— সমরেশ মণ্ডল ও দেবরাজ মাহাতো। সম্পাদক--- তমালকান্তি মাহাতো, সহ-সম্পাদক--- সৌরভ সিংহ, কোষাধ্যক্ষ— সজল চার।

১ জুলাই বাঁকুড়া জেলার বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের বৈঠকে সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি— অপূর্ব পাত্র, সহ-সভাপতি— রাজীব পণ্ডিত, সম্পাদক— রাজেন্দ্র সিং, সহ-সম্পাদক— কল্যাণ কর্মকার, কোষাধ্যক্ষ— প্রবীর দে, সদস্য— অনিরুদ্ধ পতি। দুই জেলার বৈঠকে বঙ্গীয় প্রাথমিক নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদক দীনেশ সাহা এবং বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি আইনজীবী সেলের অভ্যাসবর্গ

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রারম্ভে তাঁরই রচিত একাত্ম মানবতা দর্শনের আদর্শকে পাথেয় করে পশ্চিমবঙ্গ লিগ্যাল অ্যান্ড লেজিসলেটিভ সেল তাদের কার্যকর্তাদের

প্রশিক্ষণের জন্য গত ২৭ ও ২৮ জুন বহরমপুরের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউশনে এক অভ্যাসবর্গের আয়োজন করে। ২৭ জুন বিকাল ৪ ঘটিকায় প্রদীপ প্রজ্বলনের পর ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভারতমাতা, শ্রী গুরুজী ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদিত হয়। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মাধ্যমে ভারতমাতার বন্দনার পর স্বাগত ভাষণ দেন বিজেপি লিগ্যাল অ্যান্ড লেজিসলেটিভ সেলের মুর্শিদাবাদ শাখার সভাপতি প্রবীণ আইনজীবী স্বাধীন স্যানাল। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার বিজেপি সভানেত্রী মালা ভট্টাচার্য। ২৮ জুন সকাল ৭টায় অনুষ্ঠান পুনরায় শুরু হয়। ওইদিন প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক অমলেশ মিশ্র। তিনি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনযাত্রা, কর্মপদ্ধতি এবং সর্বোপরি তাঁর একাত্ম মানব দর্শন নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন।

সর্বশেষে পশ্চিমবঙ্গ লিগ্যাল ও লেজিসলেটিভ সেলের সভাপতি সমীর পাল বক্তব্য রাখেন। বৈঠকে স্থির হয় প্রতি আইনজীবীর বাড়িতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ছবি রাখা ও ২৫ সেপ্টেম্বর পণ্ডিতজীর জন্মদিবসটিকে সমর্পণ দিবস হিসাবে পালন করা হবে। সারা বৎসর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের উপর সেমিনার আয়োজনের প্রস্তাবেও সদস্যরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। অপরাহ্নে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে এই অভ্যাসবর্গের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। শিবিরে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ৯০ জন আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন।

চম্পাহাটিতে সংস্কার ভারতীর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী পালন

সংস্কার ভারতীর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাখা গত ২৯ জুন সন্ধ্যায় চম্পাহাটিতে সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ১৭৮তম জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালন করে। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সাহিত্যিক ও কবি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট লেখক সাহাজান ইসলাম এবং প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন প্রাদেশিক কার্যকারী উপদেষ্টা সুভাষ ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশের অন্যতম সম্পাদকদ্বয় শুভঙ্কর মুখার্জী ও সুজিত চক্রবর্তী। স্থানীয় সাহিত্যিক ও কবি ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, কণিকা মণ্ডল ও শম্ভু মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন চম্পাহাটি শাখার আহ্বায়িকা অনন্যা নস্কর। অনুষ্ঠান শেষে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত পরিবেশন করেন মীরা দাস।

সীমা জনকল্যাণ সমিতির যোজনা বৈঠক

গত ৫ জুলাই কেশব ভবনে সীমা জনকল্যাণ সমিতির বার্ষিক যোজনা বৈঠক সকাল ১০টা থেকে বৈকাল ৪-৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত প্রদীপ প্রজ্বলন করে বৈঠকের শুভারম্ভ করেন। উদ্বোধনী ভাষণে কেশবজী সংগঠনের আদর্শগত দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ক্ষেত্র প্রচারক প্রমুখ রমাপদ সমাপ্তি ভাষণ দেন।

শ্রীরামপুরে শ্যামাপ্রসাদের জন্ম ও বলিদান দিবস উদযাপন

শ্রীরামপুরে গত ২৩ জুন ও ৬ জুলাই ড. শ্যামাপ্রসাদের বলিদান ও জন্ম দিবস পালিত হয়। শ্রীরামপুরে গান্ধী ময়দানে শ্যামাপ্রসাদের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যার্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ভারতমাতা সেবা সঙ্ঘ এবং নাগরিক সচেতন মঞ্চের উদ্যোগে এই দু'দিন বিভিন্ন বক্তা শ্যামাপ্রসাদের ব্যক্তিত্ব, কর্মজীবন এবং অবদান নিয়ে বক্তব্য রাখেন। ডাঃ মোহিতলাল চ্যাটার্জী, ভাস্কর ভট্টাচার্য, বাবুল মুখার্জী, সুদীপ পাল, মাস্টারজী, শ্যামল বোস-সহ বহু রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবী ব্যক্তিত্ব অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। বক্তাগণ শ্যামাপ্রসাদের অবদানের বিষয়ে জনসচেতনা জাগরণের উপর জোর দেন।

মঙ্গলনিধি

গত ৪ জুলাই দুর্গাপুর নগরের পুলক চক্রবর্তী তাঁর পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ কার্যবাহ কমল ভট্টাচার্যের হাতে। অনুষ্ঠানে প্রান্ত সেবা প্রমুখ ও সমাজসেবা ভারতীর জেলা প্রমুখ সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

কয়েকটি ব্যতিক্রমী বাংলা ছবি

বঙ্গম

বিকাশ ভট্টাচার্য

অতি সম্প্রতি বেশ কিছু ব্যতিক্রমী বাংলা ছবি বিদগ্ধ চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মুগ্ধ করেছে। প্রথমেই নাম করতে হয় সদ্য তিরিশ পেরনো যুবক আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত-র তিলতিল করে জমানো নিজের টাকায় তৈরি 'আসা যাওয়ার মাঝে'। আদিত্য কলকাতার ছেলে হলেও থাকেন মুম্বইতে। কয়েক মাসের জন্যে কলকাতায় এসে কলেজস্ট্রিটের কাছে একটা বাড়িতে সুটিং সেরে নেন। ইতালো কালভিনোর ছোট একটা গল্প 'অ্যাডভেঞ্চার্স অব আ ম্যারেড কাপল' এর ছায়ায় তৈরি আদিত্য-এর এই ছবি। পঞ্চাশের দশকের যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইতালির প্রেক্ষিত অবলীলায় চলে এসেছে আদিত্য-র একুশ শতকের কলকাতার যুবকদের কর্মহীনতা, চাষী-শ্রমিকদের আত্মহনন এবং রাজনীতিকদের নীতি হীনতার বাস্তবতায়।

'পরস্পরের কোনো সংলাপ নেই'— আসা যাওয়ার মাঝে-র দৃশ্য।

ঋত্বিক চক্রবর্তী ও নবাগতা বাসবদত্তা অভিনীত দু'টি চরিত্র। ঋত্বিকের কাজ রাতে, কাগজের প্রেসে। স্ত্রী বাসবদত্তা কাজ করে দিনের বেলায়। একটা ব্যাগের কারখানায় সে সুপারভাইজার। সকাল থেকে সন্ধ্যে খাঁ খাঁ ঘরে ঋত্বিক একা আবার সন্ধ্যের পর একলা হয়ে যায় বাসবদত্তা। পরস্পরের কোনো সংলাপ নেই। নেই পরস্পরকে একান্ত করে পাওয়ার কোনো সুযোগ। এদের সংসারের নীরবতাকে বাঙ্ময় করে তোলে পাশের বাড়ির বাচ্চার গলাসাধা, সামনের স্কুলের ছেলেদের কবিতা পড়া, ফেরিওয়ালার হাঁক, টিভির আওয়াজ। এসব দেখতে দেখতে অনেকেই হয়ত হাই তুলবেন। তবু ছবিটা এত সেনসিটিভ, এতটাই স্পর্শ-সংবেদনের মধ্যে রয়েছে যে দেখতে দেখতে চোখে জল এসে গিয়েছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের, আবেগতাড়িত হয়েছেন শর্মিলা ঠাকুর প্রমুখেরা। তবে ছবিটা নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে— ততটা দর্শক পায়নি। কোনো প্রমুখ হলে ছবিটি প্রদর্শিত হয়নি। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত এবং ভেনিস-সহ আরও আট-দশটা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত এই ছবি 'নন্দন-এক'-এ প্রদর্শিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। নন্দন দুই— যার আসন সংখ্যা এক-দেড়শো তাতে দিনে একটি মাত্র শো— তাও হাউসফুল হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখানো হয়নি। কয়েকটি মাল্টিপ্লেক্সে নিজের চেষ্টায় দেখাতে পেরেছেন আদিত্য। নেই বড় বড় হোর্ডিং, ব্যানার। শেষ পর্যন্ত পরিচালক সুমন ঘোষ এই ছবির প্রেজেন্টার হওয়ায়— মিডিয়া মহলে কিছুটা কব্জে পায় এই ছবি।

ঋত্বিক এক কথায় চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। বাসবদত্তা টিভি সিরিয়ালে পরিচিত হলেও বড় পর্দায় এটাই তার প্রথম কাজ। অপূর্ব অভিনয়। পরিচালকের প্রথম ছবি হিসেবে এই ছবি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। সেরা সাউন্ড ডিজাইনের জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন অনীশ জন।

পরিচালক সৃজিত মুখার্জী তাঁর প্রথম ছবি অটোগ্রাফ থেকেই দর্শকানুকূল্য পেয়ে এসেছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর 'চতুষ্কোণ' ছবিতে পুরস্কার এবং বক্স অফিস আনুকূল্য দুই-ই পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক ব্যতিক্রমী ছবি 'নির্বাক' সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে। এ ছবি সকলের জন্য নয়। স্বভাবতই প্রায় শূন্য প্রেক্ষাগৃহে এক সপ্তাহ চলার পর ছবিটি তুলে নেওয়া হয়। তবু বলতে দ্বিধা নেই--- এই এক্সপেরিমেন্টাল ছবি দেখে চমৎকৃত হতে হয়। নিজেকে ভালবাসা একটি মানুষ, একটি অনুভূতিশীল গাছ, প্রভুর জীবনে নারী প্রবেশে জেলাস একটি কুকুর এবং একটি মৃতদেহ ও তার প্রেমিক--- এই নিয়ে 'নির্বাক'। অভিনয়ে আবার ঋত্বিক চক্রবর্তীর নাম করতে হয়। এছাড়া অঞ্জন দত্ত, যীশু এবং মুম্বই-এর সুস্মিতা সেন নিজ নিজ চরিত্রে অনবদ্য।

বাংলা ছবির পরিভাষা বদলাচ্ছে। নতুন নতুন বিষয় নিয়ে নতুন নতুন পরিচালকেরা অপূর্ব কাজ করছেন। আজকের বাংলা ছবি অনেক বেশি স্মার্ট, সাবলীল। ঝাঁ চকচকে নতুন ধারার বাংলা ছবিতে নবতম সংযোজন মনোজ মিচিগানের '৮৯'। পূর্বা, অনুপ, সব্যসাচী— ছবির এই তিন চরিত্রে অবাক করা অভিনয় করেছেন রাইমা সেন, সতাফ ফিগর এবং শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। পূর্বা নিজে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও তার নিজেরই কিছু মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা আছে। ঘটনাচক্রে অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াডের অনুপের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ঘটনাপ্রবাহে ছবিতে আসে সব্যসাচী। সাইকো ক্রাইম থ্রিলার হলেও ছবিতে আছে নানান মানবিক দিক। তবু ছবিটি সাধারণ দর্শকের আনুকূল্য পায়নি।

শব্দরূপ-৭৫৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

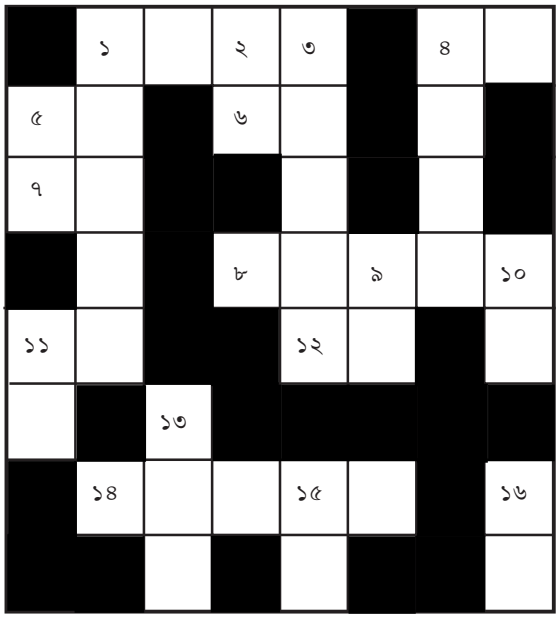

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বিখ্যাত বাংলা রামায়ণ রচয়িতা, **৪.** জৈমিনি ভারতে উল্লিখিত নীলধ্বজ রাজার মহিষী, মহাবীর প্রবীরের জননী, **৫.** 'কানু বিনা—নাই', **৬.** হিন্দি প্রতিশব্দে পত্নী, **৭.** বিস্ময়জন্য হতবুদ্ধিতা ('—লাগা'), **৮.** যা আগে ঘটে গেছে সেটা বলে দেওয়া (গল্প বা উপন্যাসে), **১১.** কুল, বংশ, **১২.** চিঠি; বিন্যস্ত অক্ষর, **১৪.** বীভৎসাচার শৈব সম্প্রদায় বিশেষ।

উপর-নীচ : ১. পালিত পুত্র, **২.** শিকারী পাখি, উলটে দিল ফুল, **৩.** চাল, কালাইবাটা ইত্যাদির পাতলা পিঠা, **৪.** মহাভারতে উল্লিখিত ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা, **৯.** বানর, **১০.** কৃষ্ণের পালক পিতা, **১১.** বিখ্যাত রবীন্দ্র উপন্যাস, **১৩.** নিরুপায় সংকটময় অবস্থা, **১৫.** রোগীর উপযুক্ত খাদ্য, **১৬.** শর্মিষ্ঠা-যযাতির পুত্র।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৫২
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
কাজল দাস
সামসী, মালদা

■	হ	ন্য	তে	■	তা	বা	স
আ	র্ষ	■	■	আ	গা	মী	■
ব	চ	না	তী	ত	■	■	দে
হ	রি	■	■	প	র	ব	শ
মা	ত	ব্ব	র	■	■	র	জ
ন	■	■	বা	উ	ল	গা	ন
■	আ	স	ব	■	■	দা	নী
দ	প্ত	র	■	চ	সা	র	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৫৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ১০ আগস্ট ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

ARE YOU SEARCHING FOR A PROPERTY PLANNER ?

PROPERTY

BUY SALE RENT

Contact
DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945
RANAJIT MAZUMDAR 9339861465

S M WEALTH INFRAREALTOR LLP | 52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

গয়ার তাঁতিপাড়া এখন ‘আই আই টি হাব’

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গয়ার মানোয়া ব্লকের পাটোয়া গ্রামকে ‘আই আই টি হাব’ হিসেবে তুলে ধরেছেন গ্রামবাসীরা। গরিব তাঁতি সম্প্রদায়ের গ্রাম হিসেবে একসময় পরিচিত ছিল। পাঁচ হাজার জনবসতির গ্রামে এখন ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যাই তিনশোর বেশি। এদের মধ্যে ষাটজনই আই আই টিয়ান। এবার এ গ্রাম থেকে ১২ জন আই আই টি-তে যোগ দেবেন। গরিব ঘরের জীতেন্দ্র ১৯৯১ সালে প্রথম আই আই টি-তে যোগ দেন। তাঁর চেষ্টাতেই গরিব ও অবহেলিত গ্রামটি এখন বিহার-ঝাড়খণ্ডের গর্বের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

আধ্যাত্মিক ও সেবাকাজে উইপ্রো’র অর্ধাংশ দান প্রেমজীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আই টি কোম্পানি উইপ্রো গ্রুপের মালিক আজিম প্রেমজী আরো একবার তাঁর বিশাল

হৃদয়ের পরিচয় দিলেন। তিনি তাঁর কোম্পানির ৩৯ শতাংশ শেয়ারের সমতুল্য অর্থ আধ্যাত্মিক ও জনসেবামূলক কাজের জন্য দান করে দিলেন। এই প্রথম নয়, আগেও এরকম উদাহরণ তিনি রেখেছেন। এবার তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী ৩৯ শতাংশ অর্থাৎ ৫৩,২৮৪ কোটি টাকা দান করবেন, যা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও সেবাকাজে ব্যয় করা হবে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বিল গেটস্ এবং ওয়ারেন বুফের স্থাপিত ‘গিভিংস প্লেজ’ অভিযানে প্রেমজীই প্রথম ভারতীয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম যুক্ত হন।

ভারতে বাড়ছে কোটিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতে দ্রুতহারে বাড়ছে কোটিপতির সংখ্যা। জানা গেছে, ২০১৮ সালের মধ্যে ভারতে কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়াবে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার। অর্থাৎ বর্তমানে যে সংখ্যা রয়েছে তার চেয়ে অনেকটাই বেশি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি ২০১৮ সালের পরের পাঁচ বছরে এই সংখ্যা বাড়বে আরও দু’ গুণ। ‘ওয়েলথ এক্স— ডিকেডস্ অফ ওয়েলথ : দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স ইন ওয়েলথ অ্যান্ড লাক্সারি’ শীর্ষক এক সাম্প্রতিক সমীক্ষাতে উল্লেখ করেছে, ‘‘আগামীদিনে দ্রুত হারে কোটিপতি ব্যক্তি বাড়বে ভারতে। ২০১৮-এর পাশাপাশি ২০২৩-এ সেই সংখ্যা আরও দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা। মূলত গত এক বছরে ভারতে কোটিপতির সংখ্যা ২৭ শতাংশ বেড়ে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজারে পৌঁছেছে। তাই আগামীদিনে সংখ্যাটা যে ক্রমশ বাড়বে তা ধরে নেওয়া হয়েছে।

মানসিক চাপে অবসাদ জাপানে আক্রান্ত ১০ লক্ষ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মানসিক রোগে আক্রান্ত জাপানের ১০ লক্ষ যুবক। রোগের নাম দেওয়া হয়েছে হিকিকোমারি। অবসাদে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করছেন তারা। তরুণ প্রজন্ম এভাবে অবসাদে গ্রস্ত হলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন দেশের সরকার। রোগের এখনো কোনো কারণ বের করতে পারেননি চিকিৎসকরা। তাঁরা অনুমান করছেন সেরা হওয়ার দৌড়ে থাকার কারণে তারা মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে অবসাদে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষজ্ঞের মতে, জাপানের জনসংখ্যার এক শতাংশ এই রোগের শিকার। এটা দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
20 July - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা